সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

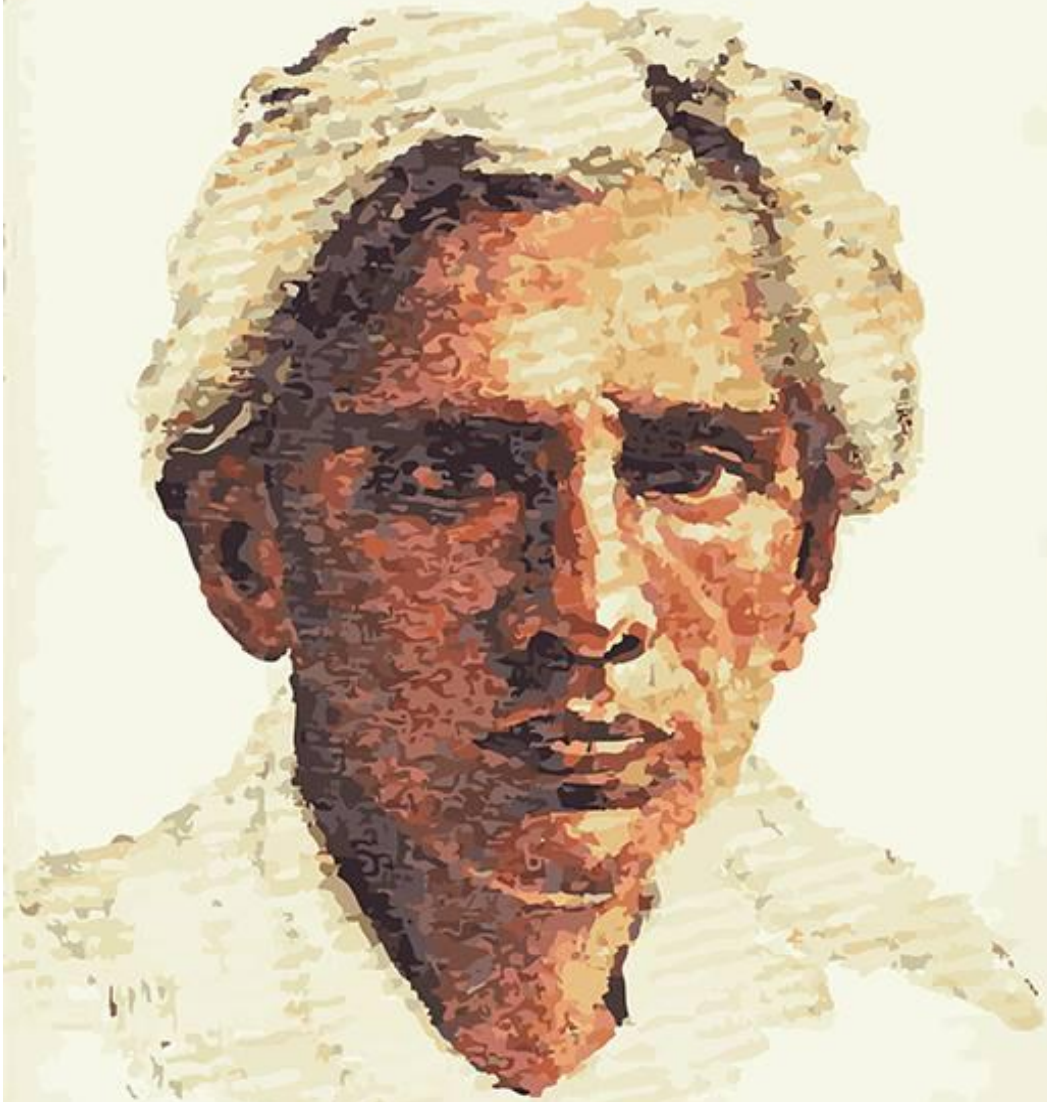

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.dlobl.org

www.boierhut.com/group

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র

গাছ হঠাৎ জন্মায় না। জন্মের পরেও গাছের বাড় ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে সারালো জমির উপরে।

শরৎচন্দ্রও হঠাৎ বড়ো সাহিত্যিকরূপে জন্মগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্যে আগেকার সাহিত্যিকরা জমি তৈরি ও বীজ বপন করে গেছেন। আগে তারই একটু পরিচয় দি।

পৃথিবীর সব দেশেই একশ্রেণীর সাহিত্য দেখা দিয়েছে যাকে বলে রোমান্টিক সাহিত্য। বিলাতের স্যার ওয়াল্টার স্কটের, ফরাসি দেশের ভিক্টর হুগোও আলেকজান্দার ডুমাসের এবং বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ওই 'রোমান্টিক' সাহিত্যের অন্তর্গত। ওঁদের উপন্যাসে অসাধারণ ঘটনার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এঁরা যেসব চরিত্রের ছবি এঁকেছেন, সাধারণত সেগুলি অতিরিক্ত রংচঙে। ওঁরা যে অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা নয়; কিন্তু ওঁরা প্রায়ই রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলিকে দেখেছেন। তাই চরিত্রগুলির উপরে যে-রং পড়েছে তা তাদের স্বাভাবিক রং নয়।

পৃথিবীতে এখন যে-শ্রেণীর সাহিত্যের বেশি চলন তাকে বলে বাস্তব-সাহিত্য। বাংলাদেশে বিশেষভাবে এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ। যদিও বঙ্কিম-যুগে—অর্থাৎ বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ-প্রভাবের সময়ে রাজর্ষি ও বউঠাকুরানির হাট রচনাকালে তিনিও রোমান্টিক সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন।

বাস্তব-সাহিত্যের লেখকেরা মানুষকে যেমন দেখেন তেমনি আঁকেন। তাঁরা পক্ষপাতী নন এবং অসাধারণ ঘোরালো ঘটনারও উপরে বেশি ঝোক দেন না। রোজ আমরা যে-সংসারকে দেখি, তারই ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে সোজা ভাষায় সহজভাবে তাঁরা বড়ো বড়ো উপন্যাস লিখতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক সাহিত্যের পূর্ণ-প্রতিপত্তির দিনেই, আর একজন বাঙালি লেখক বাস্তব-সাহিত্য রচনা করে নাম কিনেছিলেন। তার নাম স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তার স্বর্ণলতা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। ঘরোয়া সুখ-দুঃখের হুবহু ছবি আঁকার দরুন তারকনাথের যশ শরৎচন্দ্রের মতোই হঠাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বর্ণলতা'র সংস্করণের পর সংস্করণ হতে থাকে। বঙ্কিম-যুগে আর কোনও লেখকের বই এত কাটেনি।

'স্বর্ণলতা'র কাটতি দেখে বহু লেখক তারকনাথের নকল করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের অনুকরণ স্বর্ণলতার মতন সফল হয়নি, কারণ নকলকে কেউ আসলের দাম দেয় না।

তারকনাথ আরও কিছু লিখে গেছেন। কিন্তু তার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শক্তি বড়ো ছিল না। বঙ্কিম-যুগে তার প্রতিভা স্ফুলিঙ্গের মতোই আমাদের চক্ষে পড়ে।

সেইজনেই আমরা বলেছি, বাংলাদেশে বিশেষভাবে বাস্তব-সাহিত্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথই। ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তার বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বাস্তব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিশক্তি তিনি বিস্তৃত করে তুলেছেন। কেবল নিত্য-দেখা সংসারকেই তিনি তুলে এনে আবার সাহিত্যের ভিতরে দেখাননি, তার সাহায্যে নব নব ভাব ও আদর্শকে খুঁজেছেন। তারকনাথ এসব পারেননি।

শরৎচন্দ্র যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলাদেশে সত্যিকার বড়ো আর কোনও ঔপন্যাসিককেই দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথও কেবল উপন্যাস নিয়ে কোনওদিনই নিযুক্ত থাকেননি। কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিক নন, একাধারে তিনি মহাকবি, নাট্যকার, গীতিকার, ছোটোগল্প লেখক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক এবং প্রত্যেক বিভাগেই নব নব রসের স্রষ্টা।

হিসাব করলে দেখা যাবে, তার নানাশ্রেণীর রচনার মধ্যে উপন্যাস খুব বেশি জায়গা জুড়ে নেই।

কাজেই বাস্তব-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরোয়া আলোছায়ার ছবি আঁকতে পারেন এবং কথাসাহিত্যের সাধনাই হবে যার জীবনের প্রধান সাধনা, দেশের তখন এমন একজন লোকের দরকার হয়েছিল। দেশের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি একান্তভাবেই ঔপন্যাসিক।

শরৎচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কতটা ভারতী'তে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সময়েই সেটা জানা গিয়েছিল। গোড়ার দিকে বড়দিদি বেরুবার সময়ে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু পাঠকেরা লেখা পড়ে ধরে নেন যে, রবীন্দ্রনাথই নাম লুকিয়ে ওই উপন্যাস লিখছেন। কেউ কেউ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কোনও কোনও গল্প ও উপন্যাসের বিষববস্তু দেখলে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে পড়বেই। কিন্তু বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্রসীমা ও দৃষ্টিশক্তি বিস্তৃততর করে তুলেছিলেন, তাই পরবর্তী যুগের লেখক শরৎচন্দ্রও তারকনাথকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন ঢের বেশিদূর।

এখানে আর একটা কথাও বলে রাখা দরকার। শরৎ-সাহিত্যের খানিক অংশ রবীন্দ্রনাথ প্রভাবগ্রস্ত বটে, কোনও কোনও স্থলে তার বিষয়বস্তু তারকনাথকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তার অনেকটা অংশই একেবারে আনকোরা। সেখানে শরৎচন্দ্র নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করছেন এবং সেটা হচ্ছে তার প্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন দান। এই নূতনত্বের জন্যেই শরৎচন্দ্রের নাম অমর হয়ে রইল।

এইবারে আর একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলব। স্টাইল বা রচনাভঙ্গির কথা। যে লেখকের নিজের রচনাভঙ্গি আছে, লেখার তলায় তার নাম না থাকলেও লোকে কেবল লেখা দেখেই তাকে চিনে নিতে পারে।

আজ পর্যন্ত এমন বড়ো বা ভালোলেখক জন্মাননি, যার নিজস্ব রচনাভঙ্গি নেই। ফরাসিদেশে ফ্লবেয়ার নামে একজন লেখক ছিলেন, তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর রচনাভঙ্গির গুণেই। এক-একজন বড়ো লেখকের রচনাভঙ্গি আবার এতটা বিশিষ্ট ও শক্তিশালী যে, তা সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ যুগকে প্রকাশ করে। কারণ সেই যুগের অন্যান্য লেখকদেরও উপরে তাদের রচনাভঙ্গির প্রভাব দেখা যায় অল্পবিস্তর।

বাংলাদেশে দুইজন প্রধান লেখকের রচনাভঙ্গি সাহিত্যের দুইটি বিশেষ যুগকে চিনিয়ে দেয়। তারা হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আলোচনায় প্রায়ই বঙ্কিম-যুগও 'রবীন্দ্র-যুগের' কথা শোনা যায়, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির প্রাধানের জন্যেই ওই দুই যুগের নামকরণ হয়েছে। বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাভঙ্গির উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কম-বেশি ছাপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধেও ওই কথা। এখনকার কোনও লেখকই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির প্রভারের ভিতরে না গিয়ে পারেন না। কেউ কেউ পুরোদস্তর নকলিয়া। সাহিত্যে তাঁদের ঠাঁই নেই।

কোনও লেখকই গোড়া থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাভঙ্গির অধিকারী হতে পারেন না, কারণ বহু সাধনার ফলে ধীরে ধীরে নিজস্ব রচনাভঙ্গি গড়ে ওঠে। এমনকী রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম বয়সের কবিতায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী বলে রবীন্দ্রনাথ খুব শীঘ্রই বিহারীলালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। বিহারীলালের সব শিষ্য এটা পারেননি। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখায় শেষ পর্যন্ত বিহারীলালের রচনাভঙ্গি বিদ্যমান ছিল।

শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গি কী-রকম? তার রচনাভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির মতন অতুলনীয় ছিল না; সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেমন আপন আপন রচনাভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, শরৎচন্দ্র সেভাবে বহু লেখককে আকৃষ্ট করে কোনও নুতন যুগসৃষ্টি করতে পারেননি। তবু তার লেখবার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সম্পূর্ণরূপে তারই নিজের জিনিস।

শরৎচন্দ্রকে দুই যুগপ্রবর্তক বিরাট প্রতিভার আওতায় কলম ধরতে হয়েছিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাভঙ্গির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। পরে বঙ্কিমের প্রভাব কমে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেড়ে ওঠে। কিন্তু কী বঙ্কিমচন্দ্র আর কী রবীন্দ্রনাথ, কেহই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ বা সমগ্রভাবে অভিভূত করতে পারেননি। যারা রঙের কারখানায় কাজ করে তারা গায়ে মুখে জাম-কাপড়ে নানা রঙের প্রলেপ মেখে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাই বলে কেউ তাদের চিনতে ভুল করে না— কারণ তাদের আসল চেহারা অবিকৃতই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কারখানায় গিয়ে শরৎচন্দ্র যে প্রথমে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, তার রচনাভঙ্গির ভিতরে কেবল সেই চিহ্নই আছে—জগতে এমন কোনও লেখক নেই, পূর্ববর্তী ওস্তাদ-লেখকের কাছ থেকে যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি; আসলে শরৎচন্দ্রের সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা-পদ্ধতির ভিতরে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবই বেশি। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে কোনও রচনা না জানিয়ে রেখে দেওয়া হোক; যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে সে শরৎচন্দ্রের রচনাকে বেছে নিতে ভুল করবে না।

শরৎচন্দ্রের বড়দিদি 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল লেখকের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারও কয়েক বছর পরে, ১৩১৩ অব্দে।

সে সময়ে মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ছিল‘ ভারতী’ ‘সাহিত্য’ ‘প্রবাসী’ ‘নব্যভারত’ ও ‘মানসী" কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-উপন্যাসগুলির বিপুল প্রভাব। নাট্যসাহিত্যে তখন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী চলেছে; বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। কাব্যসাহিত্যে প্রধানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং নবীনদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। নানা শ্রেণীর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে লিপিকুশলতা, রচনাভঙ্গি ও চিন্তাশীলতার জন্যে তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরি বা বীরবল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের মতো শরৎচন্দ্রেরও আবির্ভাব মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ও-ক্ষেত্রে সম্পাদকরূপে তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম খুব বেশি। সুরেশচন্দ্র মিষ্ট ভাষা ও বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থায়ী সাহিত্যের জন্যে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যাননি।

খুব সংক্ষেপেই তখনকার সাহিত্যের অবস্থার ও তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমাদের স্থান অল্প, তাই এখানে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা শোভনও হবে না। তবে আমাদের ইঙ্গিতগুলি মনে রাখলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা হয়তো সহজ হবে।

শৈশব-জীবন (১৮৭৬-১৮৮৬)

হুগলি জেলার একটি গ্রামের নাম হচ্ছে দেবানন্দপুর। যদিও এক সময়ে দেবানন্দপুরের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তবু একালে এ গ্রামটির নাম কিছুকাল আগে খুব কম লোকেরই জানা ছিল। কিন্তু এখন শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে দেবানন্দপুর আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশ, নগর ও গ্রাম বড়ো হয় মানুষেরই মহিমায়। কোনও বিশেষ দেশে জন্মেছে বলে কোনও মানুষ বড়ো হতে পারে না। অনেকে বড়ো হবার জন্যে বড়ো বড়ো দেশে যান। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ নিজেই বড়ো হয়ে নিজের দেশকে বড়ো করে তোলেন।

এই দেবানন্দপুরে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মতিলাল ধনী ছিলেন না, ছিলেন তার উলটোই—অর্থাৎ গরিব মতিলাল ছিলেন সেকালকার অনেক ব্রাহ্মণেরই মতন নিষ্ঠাবান, কারণ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি। এখন বিলাতি শিক্ষায় অনেকেই ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যের কথা ভুলে যান, কিন্তু মতিলাল নাকি এ-দলের লোক ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের কথায় জানতে পারি, মতিলালের আর একটি গুণ ছিল তা হচ্ছে সাহিত্যপ্রীতি।

মতিলালের সহধর্মিণীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী। এর কথা ভালো করে এখনও জানা যায়নি, শরৎচন্দ্রের উক্তি থেকেও তার কথা জানা যায় না। তবে তার সম্পর্কে-ভাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন তিনি বড়ো সাদা-মাঠা লোক ছিলেন। কিন্তু এই নিতান্ত সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে একটি মেহের সমুদ্র নিহিত ছিল। তিনি কোনওদিন কাহারও সহিত সম্বন্ধের দাবির দিক দিয়া ব্যবহার করিতেন না। কর্তারা তাহার সেবা-ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা

ছিলাম সেই বিশুদ্ধ মেহের উপাসক। আজও তার কথা মনে করিতে বুকের মধ্যে চাপা ব্যথার মতো বোধ হয়—চক্ষু সরস হইয়া উঠে!

১২৮৩ সালের ভাদ্র মাসের ৩১শে (ইংরেজি ১৮৭৬ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) তারিখে মতিলালের প্রথম পুত্রলাভ হয়। এই ছেলেটিই বাংলার আদরের নিধি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গরিব হলেও প্রথম পুত্রসন্তান লাভ করে মতিলাল ও ভুবনমোহিনী যে আনন্দের আতিশয্যে খানিকটা ঘটা করে ফেলেছিলেন, এইটুকু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু শিশুর ললাটে সেদিন বিধাতা-পুরুষ গোপনে যে অক্ষয় যশের তিলক একে দিয়েছিলেন, পিতা বা মাতা কেউ সেটা আবিষ্কার করতে পারেননি। এবং এই শিশু বড়ো হয়ে যখন পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধন্য করলেন আপন প্রতিভায়, দুর্ভাগ্যক্রমে মতিলাল বা ভুবনমোহিনী সেদিন বিপুল আনন্দে পুত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্যে সংসার-নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন না!

শরৎচন্দ্রের আরও ছয়টি ভাই জন্মেছিলেন।

মধ্যভ্রাতার নাম প্রভাসচন্দ্র। অল্প বয়সেই সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে তিনি নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী প্রভাসচন্দ্রের নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মের দেশে দেশে ছিল তার কার্যক্ষেত্র। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, শরৎচন্দ্র তখন পাণিত্রাসে বাস করছেন। রুগ্নদেহ নিয়ে বেদানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আবাসে গিয়ে উঠলেন এবং শরৎচন্দ্রেরই কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্র স্বামী বেদানদের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি সমাধিমন্দির রচনা করে দিয়েছেন এবং পাণিত্রাসে অবস্থানকালে প্রতিদিন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার স্মৃতির তীর্থে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতেন।

বর্তমান আছেন শরৎচন্দ্রের একমাত্র সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের আগ্রহে বিবাহ করে তিনি গৃহী হয়েছেন বটে, কিন্তু তারও প্রথম জীবনের কিছুকাল কেটেছে ভবঘুরের মতো।

এবং শরৎচন্দ্রও প্রথম যৌবনে ছিলেন ভবঘুরের মতো। মাঝে মাঝে গৈরিক বস্ত্র পরে বেড়াতেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মতিলালের বংশে সন্ন্যাসের বীজ গুপ্ত হয়ে ছিল, তার পুত্রদের সংসারের বাঁধন সহ্য হত না। এ-সবের উপরে হয়তো মতিলালের কতকটা প্রভাব ছিল।

শরৎচন্দ্রের দুই বোন—শ্রীমতী অনিলা দেবী ও শ্রীমতী মণিয়া দেবী। বড়ো বোন অনিলা দেবীর নাম নিয়েই শরৎচন্দ্র যমুনা' পত্রিকায় নারীর মূল্য' নামে বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই বোনটির কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই আনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়িরই অনতিদূরে পাণিত্রাসে এসে নিজের সাধের পল্লি-ভবন স্থাপন করেছিলেন। ছোটো বোন মণিয়া দেবীর শ্বশুরালয় হচ্ছে আসানসোলে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের নাম স্বর্গীয় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি হালিশহরের বাসিন্দা ছিলেন। তার দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ঠাকুরদাস। তারা ভাগলপুরে প্রবাসী হয়েছিলেন। ঠাকুরদাস স্বর্গে। শরৎচন্দ্রের একমাত্র নিজের মামা বিপ্রদাস এখন পাটনায় থাকেন।

হালিশহর ও কাঁচড়াপাড়া একই জায়গার দুটি নাম। নৈহাটিও এর পাশেই। একসময় এ অঞ্চল সাহিত্যচর্চার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাহিত্য সেবকেরই জন্মভূমি হচ্ছে এই অঞ্চলে। শরৎচন্দ্রের মাতামহ-পরিবারেও যে সাহিত্যচর্চার বীজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ওদিক থেকেও তার কিছু কিছু সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা আসা অসম্ভব নয়। প্রেরণ যে-কোনও দিক

থেকে কখন কেমন করে আসে তা বলা বড়ো শক্ত। সকলের অগোচরে স্ফুলিঙ্গের মতো সে মানুষের মনে ঢোকে। তারপর যখন অগ্নিতে পরিণত হয়, সকলের চোখ পড়ে তার উপরে। তবে শরৎচন্দ্রের নিজের বিশ্বাস, তিনি পিতারই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

ঠাকুমা নাকি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত আদর দিতেন, নাতির হরেকরকম দুষ্টুমি দেখেও তাঁর হাসিখুশি একটুও ম্লান হত না। এবং শোনা যায় বালক শরৎচন্দ্রের দুষ্টামির কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে 'দেবদাস'-এর প্রথমাংশে। নিজের বাল্যজীবনের প্রথমাংশের কথা শরৎচন্দ্র এইভাবে বলেছেন

'ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নিজীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন, সেখানে আর একদফা সংবর্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়' 'পদ্যপাঠে' মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাধে চাপে। আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার আদর-আপ্যায়ন সংবর্ধনার ঘটা। এমনি বোধোদয়', 'পদ্যপাঠেও বাল্যজীবনের এক অধ্যায়.সাঙ্গ হল।'

এইটুকুর ভিতর থেকেই বালক শরৎচন্দ্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! তিনি সুবোধ বা শান্ত বালক ছিলেন না। লেখাপড়ায় তার মন বসত না। যখন পাঠশালায় যাবার কথা, শরৎচন্দ্র তখন পাড়ার আরও কতকগুলি তারই মতন শিষ্ট ছেলের সঙ্গে দুপুরের রোদে হাটে-বাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন, কখনও ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভেসে যেতেন, কখনও

খালে-বিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন, কখনও যাত্রার দলে গিয়ে গলা সাধতেন, আবার কখনও বা নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়তেন এবং গুরুজনরা দিনের পর দিন তার কোনও খোজ না পেয়ে ভেবে সারা হতেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যেত, ক্ষতবিক্ষত পায়ে, ধুলো-কাদা-মাখা গায়ে, উস্কযুদ্ধ চুলে দীনবেশে অপরাধীর মতো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। গুরুজনরা আদর-আপ্যায়নের পালা' শুরু করলেন—অর্থাৎ ধমক, গালাগলি, উপদেশ, ঘুষি চড় কানমলা—হয়তো বেত্রাঘাতও তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অনুপস্থিতির জন্যে গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে আর একদফা আদর-আপ্যায়ন লাভ। অভ্যর্থনার গুরুত্ব দেখে শরৎচন্দ্র ভয়ে ভয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে লক্ষ্মছেলের মতন 'বোধোদয়' খুলে বসতেন! কিন্তু মাথায় যার 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর ঘূর্ণি ঘুরছে ডানপিটের উদাম স্বাধীনতা একবার যে উপভোগ করেছে, এত সহজে সে-ছেলের বোধোদয় হবার নয়—ঝড়কে কেউ বাক্সবন্দি করে রাখতে পারে না! গায়ের ব্যথা মরার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন আবার উড়ু উড়ু করে, তখন কোথায় পড়ে থাকে 'পদপাঠ'-এর শুকনো কালো অক্ষরগুলো, আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় গুরুজনের রক্তচক্ষুর বিভীষিকা! ইস্কুলের ঘন্টা বাজলে পর দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তার জায়গায় হাজির নেই। শরৎচন্দ্রের প্রথম বাল্যজীবনের এই স্মৃতি থেকেই হয়তো তাঁর অতুলনীয় কথাসাহিত্যের কোনও কোনও অংশের উৎপত্তি! একটি বালিকাও নাকি দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শৈশব লীলাসঙ্গিনী ছিল এবং তার কাহিনি তিনি পরে কোনও কোনও বন্ধুর কাছে কিছু কিছু বলেছিলেন। কিন্তু এই বালিকাটির নাম কেউ তার মুখে শোনেনি। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুতুলের সংসার নিয়ে এই অনামা মেয়েটির খেলা করতে ভালো লাগত না, সেও গুরুজনদের শাসন না মেনে যাত্রা করত দুর্দান্ত ছেলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেপরোয়া খেলার জগতে,—যেখানে প্রচণ্ড রৌদ্রে বিপুল প্রান্তর দগ্ধ হয়ে যায়, যেখানে নিবিড় অরণ্যের ভয়ভরা অন্ধকারে দিনের আলো মূর্ছিত হয়ে পড়ে, যেখানে বর্ষার ধারারয় স্ফীত

নদীর প্রবাহে শরৎচন্দ্রের নৌকা ঝোড়ো-হাওয়ার পাগলামির আবর্তে পড়ে দুলে দুলে ওঠে! মেয়েটির মন ছিল মেঘ-রৌদ্রে বিচিত্র—মুখ-চখ ঘুরিয়ে ঝগড়া করতেও জানত, আবার হেসে গায়ে পড়ে ভাব করতেও পারত। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও কোনও কোনও নারী-চরিত্রের মধ্যে নাকি এই মেয়েটির ছবি আঁকা আছে, কিন্তু কোন কোন চরিত্রে তা কেউ জানে না।

এমনি বারকয়েক পলায়ন ও প্রত্যাগমনের পর মতিলাল ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। ভাগলপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় মাতুলালয়। এর পরে সেইখানেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তার সঙ্গে আমরাও দেবানন্দপুরের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছি। দেবানন্দপুরের জল-মাটি শরৎচন্দ্রের দেহকে যেভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, তার ভিতর থেকেই ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করেন বঙ্গসাহিত্যের শরৎচন্দ্র। শিশু-শরৎচন্দ্রের কথা আরও ভালো করে জানা থাকলে তার সাহিত্যজীবনের ভিত্তির কথাও আরও ভালো করে বলতে পারা যেত। কিন্তু শিশু-শরৎচন্দ্রকে সজ্ঞানে দেখেছে এমন কোনও লোকও আজ বর্তমান নেই এবং গরিব বামুনের এক দুরন্ত ছেলের ভাবপ্রবণতার ভিতর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করবার আগ্রহও কারুর তখন হয়নি। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের সম্পূর্ণইতিহাস সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন।

দেবানন্দপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রকে আবার কিছুদিনের জন্যে দেবানন্দপুরে ফিরতে হয়েছিল। তখন ভাগলপুর থেকে তিনি বালকের পক্ষে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের ঝোক নিয়ে এসেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন

‘কিন্তু এবারে আর ‘বোধোদয়’ নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ খুলে বার করলাম ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’। আর বেরোল ‘ভবানী পাঠক’। গুরুজনদিগের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাই করে নিতে হল আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা

শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে, জানিনে। একই স্কুলে বেশি দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাস্টারমশাই একদিন স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হল শহরে। বলা ভালো, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি।'

এইখানে প্রকাশ পাচ্ছে, দ্বিতীয়বার দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ফিরেছে সাহিত্যের দিকে। তখন দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছিল না। তাই শরৎচন্দ্রের মতো আরও বহু বিখ্যাত সাহিত্যিককেই প্রথম মনের খোরাক যুগিয়েছে ওই 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বা ওই-শ্রেণীরই পুস্তকাবলী। আরও দেখা যাচ্ছে, তখন কলম না ধরলেও নিষিদ্ধ পুস্তকের পাঠক বা কথক শরৎচন্দ্র গোয়ালঘরে কতকগুলি শ্রোতা জুটিয়েছেন। তারা কারা? হয়তো যারা স্কুলে বন্দি হওয়ার চেয়ে শরৎচন্দ্রের টো-টো কোম্পানিতেই ঢুকে হাটে-মাঠে পথে-অপথে বেড়াবার জন্যে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করত। সে-দলের কারুর পাকা মাথার সন্ধান যদি আজ পাওয়া যায়, তাহলে শরৎচন্দ্রের দুর্লভ বাল্যজীবনের বহু উপকরণই সংগৃহীত হতে পারে। আশা করি, শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর জীবনীর লেখক এ-চেষ্টা করতে ভুলবেন না।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাস্তুভিটা এখন অন্য লোকের হস্তগত। সে ভিটার সঙ্গে তাঁর শৈশব-স্মৃতির অনেক মধুর সুখ-দুঃখ জড়িত আছে বলে পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র বাড়িখানি আবার কেনবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি।

বাল্যজীবন ও প্রথম যৌবন (১৮৮৬-১৮৯৬)

'এলাম শহরে। একমাত্র 'বোধোদয়'-এর নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—'সীতার বনবাস', 'চারুপাঠ', 'সদ্ভাব-সদগুরু' ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটল। তখন ধারণাও ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

ভাগলপুরের বাংলা ইশকুলে ঢুকে শরৎচন্দ্রের মনের ভাব হয়েছিল কী রকম, তার উপর-উদ্ধৃত উক্তি থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ছাত্রবৃত্তি কেলাসে ভর্তি হয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন তার সহপাঠীরা তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে কারুর পিছনে পড়ে থাকবেন, এটা বোধহয় তার ধাতে ছিল অসহনীয়। লেখাপড়ায় তখনই তার ঝোঁক হল। একাগ্র মনে বিদ্যাচর্চা করে অল্পদিনের ভিতরেই তিনি তার সহপাঠীদের নাগাল ধরে ফেললেন।

স্বগ্রাম ছেড়ে এত দূরে দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়িতে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করার একটা প্রধান কারণও বোধহয় শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শরৎচন্দ্রের যৌবনের অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আমরা দেখব যে, শরৎচন্দ্রের ওই দারিদ্র্যের জন্যে বাংলা সাহিত্যও কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!

ছাত্রবৃত্তি কেলাসে শরৎচন্দ্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইশকুলের যে ঘড়ি দেখে ছুটি দেওয়া হত, শরৎচন্দ্র ও তার সঙ্গীরা রোজ কাঁধাকাঁধি করে দেওয়ালের উপরে উঠে সেই বড়ো ঘড়িটার কাটা

এত এগিয়ে দিতেন যে, অনেক সময়ে প্রধান শিক্ষক সেই বেঠিক ঘড়িকে বিশ্বাস করে এক ঘণ্টা আগেই ইশকুল বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শেষে যেদিন ছেলেরা ধরা পড়ল, সেদিন কিন্তু দোষীদের দলে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যায়নি। তিনি অভিমনু-জাতীয় বালক ছিলেন না, বিপদের মুহূর্তে বৃহভেদ করে সরে পড়তে পারতেন যথা সময়ে!

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের যে বাংলা ইশকুলে ঢুকে ১৮৮৭ অব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেটি নাকি এখনও বিদ্যমান। এর পর তিনি ওখানকারই তেজনারায়ণ জুবিলি কলিজিয়েট ইশকুলে ভর্তি হন। ওখানে গিয়ে নাকি তার পড়াশুনায় মতি হয়েছিল, কারণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' খবর দিয়েছেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠেন। মনোযোগী ছাত্র হিসাবে তাহার বেশ সুনাম ছিল। ভারতবর্ষ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশ

'এনট্রান্স পাস করিয়া সেই ইশকুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে মাত্র ২০ টাকা ফি দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞ তিনি পালন করিয়াছিলেন।'

কুড়ি টাকার অভাবে তাঁর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা আরও অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদও বেরিয়েছে। তিনি নাকি চাকরি করে পিতার অর্থকষ্ট দূর করবার জন্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৮৯৪ অব্দে, সতেরো বৎসর বয়সে। কলেজ ছাড়বার কিছু পরেই (১৮৯৬) তিনি মাতৃহীন হন।

ইশকুলের কেলাসে শরৎচন্দ্রের পাঠ্যপুস্তকভীতি হয়তো দূর হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তিনি 'গুড বয়' খেতাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু ইশকুলের বাইরে খেলাধূলার উৎসাহ তার কিছুমাত্র কমেনি এবং এ-বিভাগে তার দক্ষতাও ছিল

নাকি যথেষ্ট। দল গড়ে নিজে দলপতি হবার শক্তিও যে তার হয়েছিল, সে পরিচয়ও আছে। তার মাতুল-সম্পর্কীয় বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন

'শৈশবে আমরা শরৎকে আমাদের খেলার দলের দলপতিরূপে পাইয়াছিলাম। ডাকাতের দলের সর্দারের দোষগুণ বিবৃতিতে সিক্ত হৃদয় যেমন যুগপৎ আনন্দে বিষাদে মথিত হইয়া ওঠে,—আজও আমাদের দলপতির কথা স্মরণ করিলে অন্তরের মধ্যে তেমনি হয়, ব্যথার সুর বাজিতে থাকে। একদিকে ইস্পাতের মতন কঠিন—অন্যদিকে নবনীকোমল। অন্যায়কে পদদলিত করিবার দুর্ধর্ষ সংকল্প, আবার দুর্বলের পরম কারুণিক আশ্রয়দাতা। বালক্কশরৎ রুদ্রতায় বজ্রের মতোই কঠোর ছিল। সময় সময় মনে হইত সে হৃদয়হীন। যাহারা সেই দিকের পরিচয় পাইল তাহারা তাহার শত্রুই রহিয়া গেল; কিন্তু অশেষ স্নেহভাজনের দলের তো অভাব নাই।'

পরের জীবনেও তার এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। কোনওদিনই তিনি কোনও দলে মিশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করাটা পছন্দ করতেন না। এমনকী যে দলে তার সমবয়সীর সংখ্যাইবেশি, সেখানেও যৌবন উত্তীর্ণ হবার আগেইশরৎচন্দ্র নিজেকে বুড়ো বলে মুরুঝিয়ানা করতে ভালোবাসতেন এবং দলপতি হবার কোনও কোনও গুণও তাঁর ছিল।

ভাগলপুরে গিয়েও অন্যান্য খেলাধূলার সঙ্গে থিয়েটারের আকর্ষণও তিনি এড়াতে পারেননি। কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি নিজেও নাকি ভালো থিয়েটারি অভিনয় করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীতে তিনি নাকি একটি নারী-ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুনাম কিনেছিলেন থিয়েটারে শখের অভিনয় করবার জন্যে হয়তো শরৎচন্দ্রের আগ্রহের অভাব ছির না, হয়তো কোনও কোনও দলে গিয়ে ছোটখাটো ভূমিকায় তিনি মহলাও দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রঙ্গমঞ্চে

নেমে অভিনয় করে তিনি অতুলনীয় নাম কেননি নিশ্চয়ই। কারণ ও-বিভাগে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রাজু। তার কথা পরে বলব।

তার নিজের মুখে আমরা এই গল্পটি শুনেছি 'শখের থিয়েটারে স্টেজে উঠে যেদিন প্রথম কথা কইবার সুযোগ পেলুম, সেদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। আমার পার্টে কথা ছিল মোটে এক লাইন! আর-একটি ছেলের সঙ্গে আমি স্টেজে নামলুম। আগে তারই পার্ট বলবার কথা। কিন্তু সে তো নিজের পার্ট বললেই, তার উপরে আমি মুখ খোলবার আগেই আমার জন্যে নির্দিষ্ট এক লাইন কথাও অম্লানবদনে বলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

দুঃসাহসীডিনপিটে ছেলের যেসব খেলা, ভাগলপুরে গিয়ে বিদ্যাচর্চার অবকাশে সর্দার শরৎচন্দ্র তাঁর দুরন্ত ছেলের দলটি নিয়ে সেই সব খেলাতেও যে মেতে উঠতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই খেলার জগতে তিনি এক নূতন সঙ্গী ও বড়ো বন্ধুও লাভ করলেন। ছেলেটির নাম রাজু বা রাজেন্দ্র এবং সর্দারিতে তার আসন বোধ হয় শরৎচন্দ্রেরও উপরে ছিল। শরৎ ও রাজুর নায়কতায় যে দুষ্ট ছেলের দলটি ভাগলপুরের আকাশ বাতাস ও গঙ্গাতটকে মুখর করে তুলত, তখনকার বয়োবৃদ্ধদের পক্ষে তারা যে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছিল, এটুকু বুঝতে বেশি কল্পনাশক্তির দরকার হয় না। এই রাজু হচ্ছে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চরিত্র। গুণ্ডামি, ফুটবল-খেলা, ঘুড়ি-উড়ানো, সাঁতার,জিমনাস্টিক, হাতের লেখা, ছবি-আঁকা, পড়াশুনো, বশি হারমেনিয়াম বাজানো, গান-গাওয়া ও অভিনয় প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে রাজু ছিল অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। বাল্যবয়সেই তার সাহস ও তেজের অসাধারণতা ছিল বিস্ময়কর। ভাগলপুরের এক সাহেবের শখের আমোদ ছিল, কালা-আদমির পৃষ্ঠদেশে চাবুক চালনা ইশকুলের জনৈক মাস্টার বারংবার তার বিলাতি চাবুকের আদরে কাতর হয়ে শেষটা রাজুর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজু তখনই তার দলবল নিয়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের টমটম-সুদ্ধ ঘোড়াকে দড়ির ফাঁদে বন্দি করে সেই শ্বেতাঙ্গ অবতারকে

এমন শিক্ষা দিয়ে এল যে, তারপর থেকে শখের চাবুক-চালনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র নাকি তার 'শ্রীকান্ত'-এর ইন্দ্রনাথ চরিত্রে বাল্যবন্ধু রাজুকে অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এ কথা সত্য হলে মানতে হয়, রাজুর ভিতরে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। এবং সে রাজু আজ কোথায়? ইহলোকে, না পরলোকে? তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়েছে যে, রাজুর মনে তরুণ বয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। গঙ্গার তীরে নির্জন শ্মশানে গিয়ে সে ধ্যানস্থ হত, উপবাস করত, শিশু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা কইত না এবং স্বচক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতি দেখে খাতায় তা একে রাখত। তারপর একদিন সে ভাগলপুর থেকে অদৃশ্য হল এবং আজও তার সন্ধান কেউ জানে না। হয়তো রাজু আজ সন্ন্যাসী।

এই সময়েই বোধহয় শরৎচন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারেই ললিতকলার নানা বিভাগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জড় লোহা নিশ্চয়ই জানে না, চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে যে শিল্পী হবে, তরুণ বয়সে সেও নিশ্চয় শিল্পী বলে নিজেকে চিনতে পারে না। তবু তার মনের গড়ন হয় এমনধারা যে, আর্ট তার মনকে টানবেই। এমনকী আর্টের যেসব বিভাগ পরে তার নিজের বিভাগ হবে না, সেসব ক্ষেত্রেও সে প্রাণের সাড়া পায়; কারণ সব আর্টেরই মূলরস হচ্ছে এক।

যাত্রা-থিয়েটারের দিকে শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, কারণ ওটা হচ্ছে আর্টেরই আসর। তিনি নিজে বিখ্যাত অভিনেতা না হলেও পরে বাংলাদেশের নাট্যকলা তারই কথাসাহিত্যকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করে অল্প পুষ্টিলাভ করেনি। এবং সে হিসাবে তাকে অনায়াসেই নাট্যজগতের একজন বলে ধরে নেওয়া যায়। তারপর ভাগলপুরেই হয়তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতকলার প্রতি অনুরাগ হয়। তিনি নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করেছিলেন বলে প্রকাশ নেই; কিন্তু আমরা স্বকর্ণে শুনে জেনেছি যে, শরৎচন্দ্র ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি

নিজের চেষ্টায় শুনে এমন গান শিখেছিলেন এবং সে গান এমন কৌশলে গাইতে পারতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনত। যন্ত্রসঙ্গীতেও তার হাত ছিল বলেই শুনেছি। এবং কিছু কিছু ছবি আঁকতেও পারতেন। (পাঠকরা লক্ষ করলে দেখবেন, রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ছিল কতখানি) সাহিত্যক্ষেত্রে না এলে শরৎচন্দ্র পরে হয়তো শ্রেষ্ঠ গায়ক, বাদক বা চিত্রকররূপে আত্মপ্রকাশ করতেন; কারণ যথার্থ কলাবিদের স্বভাব নয় চিরদিন আত্মগোপন করে থাকা; আর্টের কোনও-না-কোনও পথ বেছে নিয়ে একদিন-না-একদিন তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়বেনই। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের মতো লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয় আর্ট।

এবং ইতিমধ্যে অতি গোপনে চলছিল সাহিত্যচর্চা। মাতুলালয়ে থেকে শরৎচন্দ্র কেবল নিজেই লেখাপড়া করতেন না, বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ানোরও ভার ছিল তার উপরে।

শরৎচন্দ্র পরে একাধিক বন্ধুর কাছে বলেছেন: 'আমি অনেক দলে গিয়ে মিশেছি, অনেক ভালো-মন্দ সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। সর্বদাই আমার মনে হয়েছে, আমি ওদের কেউ নই!..এই যে মনে মনে নিজেকে আলাদা করে রাখা, এটা হচ্ছে বড়ো কলাবিদের লক্ষণ। দেবানন্দপুরের গরিবের ঘরের দামাল ছেলে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এসে উচ্চতর কর্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে যদি আলাদা করে না রাখতে পারতেন, তাহলে তাকেও আজ যবনিকার অন্তরালে বাস করতে হত। যে নদী সমুদ্রের ডাক শুনেছে, মাঝপথে নিজের শাখা-প্রশাখাকে অবলম্বন করে সমস্ত জলধারা সে নিঃশেষিত করে ফেলে না, তার প্রধান গতি হবে সমুদ্রের দিকেই। লোকে যাকে কবিতা বলে শরৎচন্দ্র তেমন কবিতা কখনও লেখেননি বটে, কিন্তু তার গদ্যরচনার মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যের অভাব নেই কিছুমাত্র। অতি তরুণ বয়সেই—ভাগলপুরে থাকতেই—তার চিত্ত যে কাব্যরসে মিন্ধ হয়ে উঠেছিল

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাল্যজীব বর্ণনা করতে গিয়ে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন:

ঘোষদের পোড়োবাড়ির একধারে উত্তরদিকে গঙ্গার উপরেই একটা ঘরের পিছনে কয়েকটা নিম আর দাঁতরাঙ্গা গাছে একটুখানি ছোটো জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড় করিয়া রাখিয়ছিল। নিমের গোলঞ্চ মদনের কাটা-লতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে বেড়িয়া থাকিত যে, তাহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে এ বিশ্বাস বড়ো কেহ করিতে পারিত না। এক একদিন দলপতি কোথাও উধাও হইয়া যাইত; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তপোবনে ছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বোধ করি। আমাকে 'তপোবন' দেখানো হইবে জানিতে পারিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গুরগুর করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে শরৎ বলিল, 'তুই যদি আর কাউকে বলে দিস?' পূর্বদিকে ফিরিয়া সূর্য সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, কাউকে বলব না। কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না, বলিল 'উত্তরদিকে ফের, ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষ্য করে বল'। তাহাও করিলাম। তখন সে আমাকে সঙ্গে করিয়া অতি সন্তপর্ণে লতার পর্দা সরাইয়া একটি সুপরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেল। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়া সূর্যের কিরণ প্রবেশ করার জন্য একটা স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোয় সেই জায়গা চক্ষু ও মনকে নিমেষে শান্ত করিয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠিয়া বসিয়া সে স্নেহভরে ডাক দিল—আয়। তাহার পাশে বসিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম—খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে —গঙ্গার ও-পারে—নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। শীতল বাতাস ঝিরঝির করিয়া বহিতেছিল। সে বলিল, 'এইখানে বসে বসে আমি সব বড়ো বড়ো কথা ভাবি।' উত্তরে বলিলাম,— 'তাইতে বুঝি তুমি অঙ্কেতে একশোর মধ্যে একশোই পাও?' সে অবজ্ঞাভরে বলিল-'দ্যুৎ!'

ফিরিবার সময় সে বলিল, কোনওদিন এখানে একলা আসিসনে—

কেন?—

ভয় আছে—

ভূত?—

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, ভূত-টুত কিছু নেই।

তবে—

এখেনে সাপ থাকে।

এর আগেই আমরা দেখিয়েছি, ইতিমধ্যে একবার দেবানন্দপুরে গিয়ে শরৎচন্দ্র ইশকুলের বই ফেলে লুকিয়ে হরিদাসের গুপ্তকথা ও ভবানী পাঠক (ওদের লেখক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এক সময়ে বাঙালি পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং তার একটি নিজস্ব স্টাইলও ছিল) প্রভৃতি পড়তে শুরু করে সাহিত্যচর্চার একটি পিচ্ছল সোপানের উপরে উঠেছেন। তারপরের কথাও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনুন

‘এইবার খবর পেলুম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না! পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্ট না করেছি তা নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মহিমায় শরৎচন্দ্রের নিজেরও লেখনী ধারণের লোভ হয়েছে! এইভাবে তরুণ বয়সে বঙ্কিমের কত পাঠক যে লেখকে পরিণত হয়েছে, তার খবর কেউ রাখে না। বঙ্কিমের লেখায় যে-যাদু আছে, শরৎচন্দ্র যে তার দ্বারা কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন সেটাও লক্ষ করবার ও স্মরণ রাখবার বিষয়। শেষ জীবন পর্যন্ত বঙ্কিমের প্রভাব যে তিনি ভুলতে পারেননি, সে ইঙ্গিতও আছে। অতঃপর শুনুন

‘তারপরে এল ‘বঙ্গদর্শন'-এর নব-পর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের‘ চোখের বালি’ তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির যেন একটা নূতন আলো এসে চোখে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি আমি কোনওদিন ভুলব না। কোনও কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিন শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ-কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড়ো সম্পদ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?’

শরৎচন্দ্র ভাষা ও রচনা পদ্ধতির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী বটে, কিন্তু নিজের লেখনীধারণের গুপ্তকথা এইভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন

‘আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনওটাই তিনি শেষ করতে পারতেন না। তার লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সেকথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটোবেলায় কতবার তার অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক

বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি লিখতে শুরু করি।

যদি শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উপরে নির্ভর করি তাহলে বলতে হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের কাছকাছি কোনও সময়ে, পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলি শেস করবার আগ্রহে সর্বপ্রথম তিনি কলম ধরেন এবং সম্ভবত তখন তিনি ইশকুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, কারণ শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। শরৎচন্দ্র প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। তার প্রথম লেখনীধারণ ও আত্মপ্রকাশের মাঝখানে কেটে গিয়েছে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মতো জেগে একেবারে সাহিত্যগগনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, তারা ভ্রান্ত। দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত না হলেও সাধনা না করলে সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না। শরৎচন্দ্র সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করেননি, অধিকাংশ সাহিত্যিকের—এমনকী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গেশরৎচন্দ্রের পার্থক্য হচ্ছে এইখানে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শরৎচন্দ্র কখনও ভেবেছেন, কখনও কলম ধরেছেন এবং কখনও কলম ছেড়ে পড়েছেন—অর্থাৎসহিত্যেরও আর্টের অনুশীলন করেছেন এবং সেটাও চরম আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! হেটো আর বোকালোকেই বলবে, শরৎচন্দ্র কলম ধরেই সাহিত্য-রাজ্য জয় করে ফেললেন। আসলে যা বাইরের নয়, যা অন্তরের সত্য, শরৎচন্দ্র নিজেই তা এইভাবেই প্রকাশ করেছেন

‘এর পরই সাহিত্যের সঙ্গে হল আমার ছাড়াছড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনওদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটল প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কী করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল আমি তার কোনও খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনওদিন ঘনিষ্ঠ হবারও

সৌভাগ্য ঘটেনি, তার কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হল বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল, কবির খানকয়েক বই— কাব্য ও কথাসাহিত্য। এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই কখানা বইই বারবার করে পড়েছি। —কী তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কী তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথায়ও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা— এসব বড়ো কথা কখনও চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কী কাব্যে, কী কথাসাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।'

এইটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশরৎচন্দ্রকেবল নিজের অপরিশোধ ঋণস্বীকারই করেননি, প্রকাশ করেছেন যে, দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও এবং লেখনী ত্যাগ করেও পূর্ণতর সৃষ্টির জন্যে মনে মনে তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন। ১৩১৯ সালে কেউ কেউদৈবগতিকে তার আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারা না থাকলেও শরৎচন্দ্র আর বেশিদিন আত্মগোপন করতে পারতেন না। বড়ো নদীর স্রোতকেকেউ চারিদিকে পাথরের পাচিল তুলে একেবারে রুদ্ধ করতে পারে না। যত উচু পাচিলই তোলো, দুদিন পরে নদী বাধা ছাপিয়ে উপচে পড়বেই।

রবীন্দ্র-প্রতিভাকেই আদর্শরূপে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র স্বদেশে ও প্রবাসে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। এ আদর্শ তার সুমুখ থেকে কখনও সরে গিয়েছিল বলে মনে হয় না, শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সেও তার রচনার ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টির উপরে রবি-করের লীলা দেখা যায়। যখন বাংলার জনসাধারণের মাঝখানে তার আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যখন তার অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বাইরের আলোকে এসেছে, তখনও (১৫-১১-১৯১৫) একখানি পত্রে তিনি তার কোনও বন্ধুকে লিখেছিলেন

'আমি আবার একটা গল্প (উপন্যাস?) লিখছি। ...এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবু'র ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ তবে ধরবার জো নেই।'

সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে, সমগ্রভাবে না হোক, আংশিক ভাবেও শরৎসাহিত্যের উৎস খুঁজলে রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই দেখা যাবে।

শরৎচন্দ্র যৌবনের প্রথমেই লেখকের আসনে এসে বসলেন। সেই সময়ে বা তার কিছু আগে-পরে শরৎচন্দ্র নিজের চারিপাশে কয়েকটি তরুণকে নিয়ে একটি লেখকগোষ্ঠী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং তাদের দলপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকেই। তাদের অধিকাংশই এখন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন, যেমন—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। (যদিও সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথকে ভাগলপুরের সাহিত্য সভার নিয়মিত সভ্য না বলে ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি'র সভ্য বলাই উচিত। সৌরীন ছিলেন কলকাতার ছেলে।)

তখনকার দিনের ওই তরুণের দল নিয়মিতভাবে যে-আসরে এসে সমবেত হতেন তার নাম ছিল নাকি 'সাহিত্য সভা'। যারা প্রথম সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের ব্রত করে তুলতে চান, তাদের পক্ষে এরকম আসরের দরকার হয় সত্য-সত্যই। এসব আসরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ফলে পাওয়া যায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নব নব প্রেরণা। উক্ত সভার মুখপত্রের মতন ছিল একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্র, নাম ছায়া'। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আর একখানি পত্রিকার নাম করেছেন—তরণী'। কিন্তু এই তরণী' আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার ভবানীপুরে। এবং তার নিয়মিত লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত

প্রমথনাথ সেন (সেন ব্রাদার্স), ও শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছায়া ও তরণী ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ডাকযোগে তারা কলকাতা থেকে ভাগলপুরে কিংবা ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আনাগোনা করত এবং 'ছায়া' করত তরণী'র লেখার উত্তপ্ত ও সুতিক্ত সমালোচনা এবং তরণী'তে ছায়া'র লেখা সম্বন্ধে যেসব মতামত থাকত তারও তীব্রতা কম ধারালো ছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। ছায়া'র সযত্নে বাধানো খাতা পরে 'যমুনা'র খোরাক জোগাবার জন্যে নিঃশেষে আত্মদান করেছিল। প্রতিযোগী 'তরণী' এখন আর কল্পনাসায়রে ভাসে না বটে, কিন্তু তার কিছু কিছু নমুনা নাকি আজও পাওয়া যায়।

হাতে-লেখা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বাগান নামে অন্য খাতায় অন্যান্য রচনাও তোলা ছিল। কী কী রচনা, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি, নানা জনে নানা লেখার নাম উল্লেখ করেছেন, হয়তো নামের তালিকা নির্ভুল নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এতগুলি লেখার নাম পেয়েছিঃ 'কাক-বাসা', 'অভিমান', (ইস্টলিনের ছায়ানুসরণ), 'পাষাণ', (Mighty Atom-এর অনুসরণ), 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল', 'বড়দিদি, 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শুভদা', 'বালা', 'শিশু', 'সুকুমারের বাল্যকথা', 'ছায়ার প্রেম', 'ব্রহ্মদৈত্য', ও 'বামন ঠাকুর' প্রভৃতি। হয়তো এদের কোনও কোনওটি ওই হাতে-লেখা কাগজের সম্পত্তি নয়, স্বাধীন উপন্যাস বা গল্পের আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনও-কোনওটি হয়তো শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ত্যাগের পর লিখিত। দেখছি, শরৎচন্দ্রের তখনকার রচনার মধ্যে একাধিক অনুবাদও ছিল। কিন্তু পরের বয়সে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ তাকে বলতে শোনা গেছে—অনুবাদ করা আর পণ্ডশ্রম করা একই কথা। ও আমার ভালো লাগে না। শরৎচন্দ্রের পূর্বোক্ত রচনাগুলির কয়েকটি পরে যমুনা ও সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোনও-কোনওটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, শরৎচন্দ্র

তখন নাকি এই নাম ব্যবহার করতেন—St.c, Laraঅর্থাৎ St—শরৎ;c–চন্দ্র; এবং Laraঅর্থেশরৎচন্দ্রের ডাকনাম নাড়া' –অপূর্ব ছদ্মনাম! .

'কাক-বাসা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন উপন্যাস লেখার এই বোধ করি আদি চেষ্টা এখনি পড়বার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু সে-সময় এখনি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে!...লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল।

সুরেনবাবুর শেষ কথাগুলি পড়লে অধিকাংশ সাধারণ নূতন লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লেখকরা নিজেদের লেখার সম্বন্ধে হন অন্ধ, তাঁদের বিশ্বাস তারা যা লেখেন সবই অমূল্য রত্ন, সমজদার সুখ্যাতি না করলে তাদের দ্বিতীয় রিপু হয় প্রবল। কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই নিজের রচনার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন, যা লিখতেন তাইই তার মনের মতো হত না এবং পছন্দ না হলে নির্মমভাবে তাকে ত্যাগ করতেও পারতেন। এটা হচ্ছে প্রতিভাধরের লক্ষণ, তার বিচারনিপুণ মন নিজের কাজেও তৃপ্ত নয়! .

আজকালকার নূতন লেখকদের দেখি, প্রথম লিখতে শিখেই মাসিক সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা মহাব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সব আর্টের মতন সাহিত্যের আসরেও যে শিক্ষাকাল আছে, এটা হয়তো তারা বিশ্বাস করতে রাজি নন। গত যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই কোনও সদগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ বা কোনও বড়ো আদর্শকে সামনে রেখে হাতমকশো করতেন, কাগজে কালির আঁচড় কাটতে শিখেই মাসিকপত্রের আফিসের দিকে ছুটতেন না। শরৎচন্দ্রও এই নীতি মেনে চলতেন। তাই তার প্রথম জীবনের প্রত্যেক রচনার দৌড় ছিল হাতে-লেখা পত্রিকার আসর পর্যন্ত। সে সময় তিনি যে বাতিল হবার মতন লেখা লিখতেন না তার প্রমাণ, তার তখনকার অনেক লেখাই বহুকাল

পরে প্রকাশ্য সাহিত্যের দরবারে এসে অসাধারণ সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখেই যে পরে তার প্রথম বয়সের রচনা সাহিত্যের মতো বিখ্যাত পত্র প্রকাশ করতে রাজি হয়েছিল, তা নয়; তার মধ্যে বাস্তবিকই বস্তু ছিল। এরও প্রমাণ আছে। 'ভারতী'ও ছিল একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। ভারতী যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে যেচে বড়দিদিকে গ্রহণ করেছিল, তখন শরৎচন্দ্র নামক সাহিত্যিকের অস্তিত্বও জনসাধারণের জানা ছিল না এবং প্রথমে শরৎচন্দ্রের নাম পর্যন্ত ভারতী'তে প্রকাশ করা হয়নি। তবু সাধারণ পাঠকদের উপভোগের পক্ষে বড়দিদিই হয়েছিল আশাতীতরূপে যথেষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজের বিচারে বড়দিদি প্রভৃতি তার আদর্শের কাছে গিয়ে পৌছোতে পারেনি, তাই তখনকার মতো তারা হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যেই বন্দি হয়ে রইল, বন্ধুরা বহু অনুরোধ করেও তাদের কোনওটিকে প্রকাশ্য সহিত্যক্ষেত্রে হাজির করবার অনুমতি পেলেন না! এবং আত্মরচনা বিচার করতে বসে শরৎচন্দ্রের ভুল হয়েছিল বলেও মনে করি না। কারণ তার আত্মপ্রকাশের যুগের রচনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, প্রকাশভঙ্গি, রচনারীতি ও চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গল্প বা উপন্যাসগুলি সত্য-সতাই অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর! এ থেকেই প্রমাণিত হয়, জনসাধারণের বিচার আর শিল্পীর বিচার এক নয়!

আসল কথা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের ভিতরে সহিত্যের সৌন্দর্য তখন পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; সে আর অল্পে তুষ্ট হতে পারছে না। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছেন, তার প্রাথমিক শক্তি যাকে প্রকাশ করতে অক্ষম। তার সাহিত্য-সাধনার ধারা তখন যদি অব্যাহত থাকতে পারত, তাহলে অনতিকাল পরেই হয়তো বাংলাদেশে আমরা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য আবির্ভাব দেখবার সুযোগলাভ করতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে দরিদ্র্যের কথা আমরা আগেই

উল্লেখ করেছি, সেই দারিদ্র্যের দুর্ভাগের জন্যেই তাকে ভাগলপুর পরিত্যাগ করতে হল। তারও পরে কিছুকাল তিনি লেখনীকে একেবারে তুলে রাখেননি বটে, কিন্তু নানাস্থানী হয়ে তার নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুবিধা বোধহয় হত না। দারিদ্র্য বহু শিল্পীর সর্বনাশ করেছে এবং শরৎচন্দ্রের দান থেকেও দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে। নইলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আকার আরও কত বড়ো হত কে তা বলতে পারে?

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে মানুষ-শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আর একদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। দেখি, ছেলেবেলা থেকেই তিনি কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। এমনকী যে-বয়সে মায়ের কোলই ছেলেদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, তখনও তিনি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন! শোনা যায়, তিনি নাকি একবার পায়ে হেঁটে পুরীতেও গিয়েছিলেন। রেঙ্গুনে পালাবার আগে তিনি যে কতবার কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন, কারুর কাছে তার সঠিক হিসাব আছে বলে জানা নেই। এমনকী মাঝে মাঝে তিনি দস্তুরমতো সন্ন্যাসী সেজেও ডুব মেরেছেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেও তিনি তার সাহিত্যিক যশের লীলাক্ষেত্র কলকাতায় দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে পারেননি। কখনও থেকেছেন পানিত্রাসে, কখনও থেকেছেন বেনারসে, কখনও ছুটেছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে, শেষ-জীবনে কালাপানি লঙ্ঘন করবারও চেষ্টায় ছিলেন—বৃদ্ধ বয়সেও তার ঘর-পালানো মন তাকে অচলায়তনের মধ্যে বাধা পড়তে দেয়নি। এটা ঠিক প্রতিভার অস্থিরতা নয়, কারণ পৃথিবীর অনেক প্রতিভাই স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে রাজি হয়নি। যদিও বাংলাদেশের আর এক বিরাট প্রতিভার মধ্যে বিচিত্র অস্থিরতা দেখা যায় এবং তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

মধ্যকাল (১৮৯৭–১৯১৩)

আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকেই অল্পের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখতে চাই। কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জীবননাট্যের যে-অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে দারিদ্র্যের বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, পিতৃশোক ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যে কাতর এমন একটি মানুষকেই বেশি করে দেখতে পাই, যার মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা ছাইচাপা আগুনের মতো প্রায়-নিস্ক্রিয় হয়ে আছে। এর প্রথম দিকটায় মাঝে মাঝে অনুকূল হওয়ায় ছাই উড়ে আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলে দেননি বটে, কিন্তু তারপরেই তার লেখাটেখা বহুকালের জন্যে ধামাচাপা পড়ে। এই সময়টায়—তার নিজের কথায়—শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনওকালে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের আর কোনও সাহিত্যিক এমন দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ভুলে থেকে আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে পরিপূর্ণ মহিমায় সকলকে অবাক করে দিতে পারেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর তুলনা দুর্লভ। এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যারা প্রথম জীবনে অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনতার অভিনন্দন পেয়ে আচম্বিতে সাহিত্যধর্ম ত্যাগ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আর দেখা দেননি। যেমন ফরাসি কবি Arthur Rimband; তার সতেরো বছর বয়সের সময়ে সারা ফ্রান্স তাকে অতুলনীয় প্রতিভাবান বলে অভ্যার্থনা করেছিল, কিন্তু সাহিত্যসমাজের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে কলম ছুড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি সরে পড়লেন; চলে গেলেন একেবারে আবিসিনিয়ায়; এবং বাকি জীবন ব্যবসায়ে মেতে আর কবিত্বের স্বপ্ন দেখেননি।

কিন্তু আমরা একজন কবিকে জানি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যার তুলনা করা চলে। তিনিও জাতে ফরাসি, নাম Paul valery। বিশ বৎসর বয়সে কবিযশোপ্রার্থ হয়ে পারি শহরে এলেন। তার অসাধারণ কবিত্ব দেখে জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক তাকে খুব আদর করতে লাগলেন। কিন্তু Valery কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলেন যে, শরীরী মানুষের পক্ষে কবিত্বের চেয়ে অভাবের তাড়না ও পেটের দায় হচ্ছে বড়ো জিনিস। তিনি ছিলেন Stephane Malarme-র মতন সেই শ্রেণীর কবি, কবিতা পড়ে লোকে সহজে বুঝতে পেরে সুখ্যাতি করলে র্যারা খুশি হতেন না! সুতরাং কবিতা লিখে অন্নসংগ্রহের উপায় নেই দেখে Valery হঠাৎ একদিন ডুব মারলেন।...বছরের পর বছর যায়, Valery-র কোনও পাত্তা নেই। যে দু চারজন কবিবন্ধু তাঁকে ভোলেননি তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, কবি নিরুদ্দেশ হয়েন কোথায়? অদৃশ্য না হলে এতদিনে না জানি তার কত যশই হত! কিন্তু কেউ খবর পেলে না যে, Walery তখন কোনও ব্যবসায়ীর সেক্রেটারিরূপে অজ্ঞাতবাস করছেন এবং অবসরকালে করছেন কাব্যের বদলে গণিতবিজ্ঞানের চর্চা!

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেল! তারপর আচম্বিতে একদিন ফরাসি সাহিত্যক্ষেত্রে কবি Valery-র পুনরাবির্ভাব! এখন তিনি আধুনিক ফরাসি সাহিত্যে একজন অমর কবিরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর এক টুকরো কবিতার নমুনা হচ্ছে এই

The Universe is a blemish
In the purity of Non-being.

শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অতটা না মিললেও, ফরাসি গল্প ও উপন্যাস লেখক গী দে মোপাসার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ফ্লবেয়ারের অধীনে অপূর্ব

ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপ্রকাশ্যে শিক্ষানবিসি করে মোপাসা একটিমাত্র গল্প নিয়ে প্রথম যেদিন আত্মপ্রকাশ করলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন সেই দিনই। তারপর মাত্র দশ-বারো বৎসর লেখনী চালনা করেই মোপাসাঁ নিজের বিভাগে বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন!

সাধারণত যেসব উদীয়মান সুলেখক হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে কার্যান্তরে মন দেন, দীর্ঘকাল পরে কলম ধরলেও অনভ্যাসের দরুন আর তারা ভালো লিখতে পারেন না। সেই জন্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে এসব লেখকের পুনরাগমন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর একজন লেখককে আমরা বহুকাল পরে উৎসাহিত করে কলম ধরিয়েছিলুম। যে-বৎসরে যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই এবং ওই কাগজেই আমরা প্রকাশ করেছিলুম তার একাধিক রচনা। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার পুনরাগমন সফল হল না। অথচ পুরাত 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন সাহিত্যসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তখন সকলেই জানত, তিনি একজন খুব বড়ো লেখক হবেন। আমরা তার নাম করলুম না, কারণ তিনি হয়তো এখনও ইহলোকেই বিদ্যমান।

কিন্তু আগেই দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্র ওই-শ্রেণীর লেখকদের দলে গণ্য হতে পারেন না। সমসাময়িক সাহিত্যসমাজ থেকে নির্বাসিত ও জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি লেখনীত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার চিন্তাশীল মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেনি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের— বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—রচনা বরাবরই তার বুভুক্ষু মস্তিষ্কের খোরাক যুগিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলমই ছেড়েছিলেন, সাহিত্যকে ছাড়েননি। মন ছিল তার সক্রিয়। এবং মনই করে সাহিত্যসৃষ্টি।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য হলেন, তার তখনকার কার্যকলাপ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। বেশি কথা বলবার মালমশলাও আমাদের হাতে নেই।

নানাকারণে তাদের আত্মসম্মানে বারংবার আঘাত লাগায় পিতার সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুর, তারপর অন্যান্য জায়গায় যান—চাকরির সন্ধানে। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ ছিল, তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী! বই পড়তে ভালোবাসেন, লেখার অভ্যাস আছে, নকশা আঁকেন, ফুলের মালা গাথেন, অথচ টাকা রোজগার করতে পারেন না! শ্বশুরবাড়িতে তাই গরিব ও বেকার জামাইয়ের আর ঠাই হল না। এবং সংসারে এইটেই স্বাভাবিক। ভাগলপুরের আত্মীয়-আলয়ে মতিলাল ও শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতনের কাহিনি আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করে কাজ নেই। তার পরের কথা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ভাষাতেই শুনুন। তখন হাতে-লেখা খাতায় বা মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন

'হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, সেই অপ্রকাশিত লেখার লেখক মজঃফরপুরে আমাদের বাসায় অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে। আমার স্বামী আমার মুখেই ইতিপূর্বে শরৎবাবুর লেখার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তাই নাম জানিতেন। মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তার খুব শখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি বাঙালি ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায় অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারি বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু লোকটি বাঙালিই, একদিন গান শুনবে? নিয়ে আসব তাকে?'

'বাড়িতে সন্ধাবেলা এক একদিন গান-বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তখন তাহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল। সে সময় তিনি কিছু নূতন রচনা না করিলেও তাহার যে ফুটনোন্মুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অপেক্ষা করিয়ছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত

এবং আকর্ষীয় করিয়া রাখিত। শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাহার বন্ধুবর্গ তাহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখনকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত লোকও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর বাড়ি থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই 'শ্রীকান্তের' কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখরনাথবাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রমুখাৎ শুনি তিনি বর্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাহার মৃত্যুসংবাদও রটিয়াছিল।'

অসাধারণ মানুষ শরৎচন্দ্রের তখনকার যে-ছবিটি কল্পনায় আসছে, তা হচ্ছে এই রকম। একটি রোগাসোগা কালো যুবক, চোখে শ্রান্ত স্বপ্নবিলাসের ছাপ আছে, চেহারায় ও কাপড়েচোপড়ে পারিপাট্য নেই, লাজুক অথচ মিষ্টভাষী, মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, খোসগল্পেও সুপটু, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে হন বজের মতন কঠিন, আত্মপরিচয় দিতে নারাজ, সর্বাঙ্গে ফোটে আলাভোলা বৈরাগ্যের ভাব, পরদুঃখে কাতর, পরসেবায় তৎপর, সুকণ্ঠ, বাঁশি ও তবলায় দক্ষ এমন একজন মানুষ যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন, এটা আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু একে অপমান করতে গেলে সাহসীকেও আগে ভাবতে হয়!

মহাদেব সাহুর কাছে কাজ করবার সময়ে শরৎচন্দ্রের শিকারেরও শখ হয়। অবসরকালে প্রায়ই তিনি বন্দুক হাতে করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন।

ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের মনের কোথায় খানিকটা যে ক্ষত্রিবীর্য ছিল, সেটা পরেও লক্ষ করা গেছে। যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, সেই পরিণত বয়সেও পকেটে তিনি ধারালো বড়ো ছোরা রেখে পথে বেরিয়েছেন। একথা সত্য কি না জানি না, তবে কেউ কেউ লিখেছেন শরৎচন্দ্র নাকি সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি করেই রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনি আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিনি। তবে সশস্ত্র থাকবার দিকে তার একটা ঝোক ছিল বরাবরই। বৃদ্ধবয়সেও—ছোরা ত্যাগ করলেও—এমন এক ভীষণ মোটা লগুড় হাতে নিয়ে নিরীহ বন্ধুদের বৈঠকখানায় এসে বসতেন, যার আঘাতে বন্য মহিষও বধ করা যায়!

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন র্তার সম্পর্কে মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। হিন্দি কাগজপত্র অনুবাদ করবার জন্যে তার একজন লোকের দরকার হয়েছিল। ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র সেই কাজটি পেলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। তখনও তার পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করবারও সময় আসেনি। চির-গরিব বাপ, ছেলেকেও দেখে গেলেন দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত পরাশ্রিত অবস্থায়। অথচ এমন ছেলের জন্মদাতা তিনি।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো সম্পর্কে-মামা, অথচ বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর শখ হয়েছিল তাঁরা একটি হারমোনিয়াম কিনবেন। অথচ সকলেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। অতএব সকলে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। বক্তব্যটা এই; তুমি আমাদের একটা গল্প লিখে দাও, আমরা সেটা কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাব। পুরস্কার পেলে আমাদের হারমোনিয়াম কেনবার একটা উপায় হয়! দেখা যাচ্ছে, তখনই ওঁদের মনে ধারণা ছিল যে, শরৎচন্দ্র গল্প লিখলে সেটি পুরস্কৃত হবেই।

শরৎচন্দ্রের তখন নাম হয়নি। এবং তিনিও তখন নিজের লেখাকে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। তবু নিজের নামে প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাতেও তার আত্মসম্মানে বাধে। তাই সকলের সুদৃঢ় অনুরোধে সেইদিনই তাড়াতাড়ি 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু লেখকরূপে নাম রইল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গল্পটি প্রতিযোগিতায় হল প্রথম এবং এই হল আত্মীয়-সভার বাইরে শরৎপ্রতিভার প্রথম সফল পরীক্ষা ও প্রথম গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ! কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে ওই মন্দিরই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শেষ-রচনা!

শুনেছি, ভবানীপুরেও আত্মীয়-আলয়ে শরৎচন্দ্র নিজের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ বলে মনে করতে পারেননি—প্রায়ই প্রাণে তার আঘাত লাগত। শেষটা নিতান্ত মনের দুঃখেই তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন একেবারে অজানা দেশ রেঙ্গুনে। এত দেশ থাকতে ওই সুদূর প্রবাসে গেলেন যে তিনি কোন ভরসায়, সেটা প্রথম দৃষ্টিতে রহস্যময় বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি, তার আত্মীয়-সম্পর্কীয় ও রেঙ্গুনপ্রবাসী স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তার পথ থেকে এ বান্ধবটিকেও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্র কোনও আত্মীয়হীন দেশে গিয়ে নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল না, সেটা বলা বাহুল্য। তার উপরে তার ভিতরে ছিল শিল্পীর ভাবপ্রবণতা। সাধারণ লোকের মতো আত্মীয়-বন্ধুদের অবহেলা অনায়াসে সহ্য করবার ক্ষমতা তার মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। আগে তার মতো অনেক বেকার দরিদ্রই যেতেন ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও যখন সেই পথ অবলম্বন করে রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হন, তার সম্বল ছিল নাকি মাত্র দুই টাকা!

এবং ওই দুই টাকা ফুরিয়ে যেতেও দেরি লাগেনি। তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালিরা কিছুদিন শরৎচন্দ্রের অভাব মেটালেন, কারণ লোকের স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ কুরতে পারতেন তিনি খুব সহজেই। তারপর সওদাগরি অফিসে তার সামান্য মাহিনীর একটি চাকরি জুটল। তার তখনকার অসহায় অবস্থার পক্ষে সেই কাজটিও বোধ করি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল!

কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের অফিসে একটি কাজ পেলেন। এখানে চাকরি ছাড়বার আগে তার মাহিনী একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

এই রেঙ্গুন-প্রবাসের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের বৈরাগ্য বোধহয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তার সংসারী হবার সাধ হল এবং তাঁর সে সাধ পূর্ণ করলেন শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী। কিন্তু এর আগেই তিনি একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ করে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুর্দান্ত প্লেগ এসে তাদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!

আমাদের এক নিকট-আত্মীয় রেঙ্গুনে ডাক্তারি করেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তারই মুখে শুনেছি, রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালি-সমাজে শরৎচন্দ্র খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। গানে-গল্পে তিনি সকলকেই মোহিত করতেন। সেখানে গান, গল্প, বইপড়া, ছবি আঁকা আর চাকরি ছাড়া তার জীবনের যে আর কোনও উচ্চ লক্ষ্য আছে বাহির থেকে দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারত না। শরৎচন্দ্রের এই আর একটা বিশেষত্ব ছিল; মনে মনে নিজেকে তিনি যত আলাদা করেই রাখুন, বাহিরে আর দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারতেন। এ বিশেষত্ব রঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, সাধারণ মানুষ তাকে দূর থেকে নমস্কার করত। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার

অধুনালুপ্ত 'বাঁশরী' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'। ওই লেখাটিতে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গল্পের সঙ্গেই শিল্পী বা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই বলে কেবল গল্পের খাতিরে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে তাদের আর টেনে আনা হল না।

তবে শরৎচন্দ্রের জীবনীকথা হিসাবে, ব্রহ্মদেশের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যদিও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সাধ্যমতো আত্মগোপন করে চলতেন, তবু অবশেষে রসিক লোকেরা তাকে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তার ফলে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সভ্যদের প্রবল অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আবার অস্ত্র ধরতে হয়। তিনি 'নারীর ইতিহাস' নামে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রকাশ্য সভায় লেখাটি তার পড়বার কথা ছিল এবং সভার মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই কাপুরুষ'—মসীবীর হলেই যে বাকবীর হওয়া যায় না তারই মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। অতএব প্রবন্ধটি সভার জন্যে বাসায় রেখে, লেখক পড়লেন কোথায় সরে! যা-হোক প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের নামে ধন্য-ধন্য রব পড়ে যায়!

শরৎচন্দ্র বরাবরই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে তার রেঙ্গুনের বাসাতেও ছোটোখাটো একটি মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ বাসায় আগুন লেগে সেই সযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সঙ্গে তার রচিত একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তার অঙ্কিত চিত্রের প্রশংসিত নমুনা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালিরা আনন্দে মেতে উঠতেন—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও তার দক্ষতা ছিল অপূর্ব কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের সংবর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুনে তাকে নাকি রেঙ্গুন-রত্ন বলে সম্বোধন করেছিলেন।

রেঙ্গুন-প্রবাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে এই: ওখানে গিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাতবাস করতে, কিন্তু ওখান থেকেই হল তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। সে কথা বলবার আগে আর একটি দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দু ছেলে', 'নারীর মূল্য', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ম এই রেঙ্গুনেই। সেজন্যেও তার সাহিত্যজীবনে রেঙ্গুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং রেঙ্গুন আশ্রয় না দিলে বাংলার শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবন কোন পথে ছুটত, সেটাও মনে রাখবার কথা।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, কলকাতায় তার অজ্ঞাতে তখন এক কাণ্ড হল। শ্রীমতী সরলা দেবী তখন ভারতী'র সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থেকে তার নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্র জানতেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার সময়ে তার রচনাগুলি রেখে গেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেনবাবুর কাছ থেকে ছোটো উপন্যাস 'বড়দিদি' আনিয়ে তিন কিস্তিতে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্রের মত নেওয়া হল না, কারণ তাদের হয়তো সন্দেহ ছিল যে, মত নিতে গেলে গল্প ছাপা হবে না। এটা ১৩১৪ সালের কথা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

'এই বড়দিদি সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনি আছে। বড়দিদি যখন ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতী'তে বড়দিদির প্রথম কিস্তি পাঠ করে বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ বঙ্গদর্শনের দাবি অগ্রাহ্য করে ভারতী'তে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতরভাবে তাকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের

উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তা হয়েছে, কখনও হয়তো ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ করে রেকে থাকবে, প্রকাশ করেছে।' শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফোরিত করে বললেন, 'কবিতা-টবিতা কী বলছেন মশায়? উপন্যাস! কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ তো অবাক! বললেন, উপন্যাস কী বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখলামই বা কখন আর ভারতীতে প্রকাশিত হলই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ। পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্তমান তবু বলবেন ভুল করছ? বিরক্তিগম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য প্রকাশিত 'ভারতী' বার করে বড়দিদির পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন করে শৈলেশবাবু বললেন, 'নাম না দিলেই কী এ আপনি লুকিয়ে রাখতে পারেন? এখনও কি অস্বীকার করছেন?' শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্যবশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু-চার লাইন পড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, তারপর বললেন, 'লেখাটি সত্যিই ভারী চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের।' রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, আপনার নয়? এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।

বড়দিদি প্রথম প্রকাশের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা লেখার পাকা কারবারি, তারা এই নূতন লেখকটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখে, শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে কৌতুহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সেসব দৃষ্টি শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পারলে না। এবং শরৎচন্দ্রও জানলেন না যে, তার জন্যে কোথাও কোনও কৌতুহল জাগ্রত হয়েছে (এখানে আর একটি কথা বলা যেতে

পারে। পরে শরৎচন্দ্রের নাম যখন দেশব্যাপী, তখন একমাত্র ‘পরিণীতা’ ছাড়া আর কোনও উপন্যাসেরই বড়দিদির মতন এত বেশি সংস্করণ হয়নি।)

তিনি তখন কেরান। তিনি তখন সংসারী। এমনকী জীবনযাত্রার দিক দিয়েও তিনি তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দুর্লভ সরকারি চাকরি করেন, ক্রমেই মাহিনা বাড়বার সম্ভাবনা. আহারের ভয় আর নেই। গল্পরচনা অকেজোর কাজ, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে দুচারজন নবীন সাহিত্যযশোপ্রার্থী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তারা মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুর কথা ভাবেন। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের বড়দিদি ভালো লেগেছিল, তাদের চোখে শরৎচন্দ্রের আর কোনও নূতন লেখা এসে পড়ল না, তারা বড়দিদির কথাও ভুলে গেলেন। নব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব প্রতিভা যে মগের মুল্লুকে অজ্ঞাতবাস করছে এমন সন্দেহ তখন কেউ করতে পারেনি।

প্রকাশ্য সাহিত্যজীবন

‘একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্যসেবার ডাক এল তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হল না।

আঠারো বৎসর পরে হঠাৎ একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মতো। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোটো মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার নিকট থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজি হয়েছিলাম। কোনও রকমে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোনও রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌছোতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য-সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাদের নবপ্রকাশিত য‘মুনা’র জন্য একটি ছোটোগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোনওদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।’

উপরের কথাগুলি শরৎচন্দ্রের। ওই হল তার সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ব্যাপারটা আমরা একটু খুলেই বলতে চাই। কারণ আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে প্রায় সমস্ত ঘটনাই। এবং এখন থেকে

শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্যে আমাদের আর জনশ্রুতির বা অন্য কোনও লেখকের উপরে নির্ভর করতে হবে না।

'যমুনা' একখানি ছোটো মাসিক কাগজ। লক্ষ্মীবিলাস তৈলে'র স্বত্বাধিকারীরা প্রথমে এই কাগজখানি বের করেন। তারপর এর ভার নেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। সে হচ্ছে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। প্রথমে যমুনা'র গ্রাহক দুই শতও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তখনকার উদীয়মান এবং কয়েকজন নাম-করা লেখক লেখা দিয়ে, যমুনাকে সাহায্য করতেন। যেমন, স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা, স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ পাল, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রলাল রায়, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘটক, স্বগীর্য় ইন্দিরা দেবী, ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে—প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেহই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না। উপরে যাদের নাম করা হল তাদের অনেকেই তখন জনসাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঢের বেশি বিখ্যাত এবং তাদের সাহায্যে অনেক বড়ো মাসিকপত্র চলছে।

তবু যে 'যমুনা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে নিজের কাগজের প্রধান লেখক করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই বৃহৎ প্রতিভার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের অমন অতিরিক্ত আগ্রহ না থাকলে শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার সাহিত্যের নেশা অত সহজে পেয়ে বসত না বোধহয়।

একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে সম্প্রতি বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করার জন্যে স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের দাবি সর্বগ্রগণ্য। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রেও (২৮-৩-১৯১৬) দেখেছি, তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ফণীবাবুকে লিখেছেন আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কী? শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার কলম ধরাবার জন্যে প্রমথবাবু প্রথমে কোনও চেষ্টাই করেছেন বলে জানি না। এ-সম্পর্কে প্রমথবাবুর কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। আপাতত কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শরৎচন্দ্রকে আবার সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে আনবার জন্যে যাঁরা বিশ্লেষ চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনের বিবৃতি উদ্ধারযোগ্য

‘১৩১৯ সাল—পূজার সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আমায় বলিলেন— বড়দিদি গল্পটা আমায় পড়িতে দাও—

‘বেশ মনে আছে সেদিন কালীপূজা। বেলা প্রায় দুটার সময় আমার গৃহে বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও আমি—বাঁধানো ভারতী খুলিয়া আমি বড়দিদি পড়িতে লাগিলাম! শরৎচন্দ্র শুইয়া সে গল্প শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া বসেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—চুপ। তার চোখ অশ্রুসজল, স্বর বাষ্পার্দ্র। শরৎচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে বলিলেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখিয়াছি!

তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না। আমরা তাহাকে তিরস্কার করিলাম—লেখা ছাড়িয়া কী অপরাধ করিতেছ, বলো তো! শরৎচন্দ্র উদাস মনে বসিয়া রহিলেন—বহুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লিখব। লেখা ছাড়া উচিত হয় নাই। লেখা ভালো—আমার নিজের বুকই কঁপিয়া উঠিতেছিল! তিনি বলিলেন—চাকরিতে

একশো টাকা মাহিনা পাই। অনেককে খরচ দিতে হয়। শরীর অসুস্থ—সে দেশে আর কিছুদিন থাকিলে যক্ষ্মারোগে পড়িবেন—এমন আশঙ্কাও জানাইলেন।

আমি বলিলাম—তিন মাসের ছুটি লইয়া আপাতত কলিকাতায় চলিয়া এসো। মাসে একশো টাকা উপার্জন হয়—সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

শরৎচন্দ্র কহিলেন-দেখি।

তার প্রায় তিন মাস পরে। শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় আসিলেন।

'যমুনা;- সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন— ওই 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন।

শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি পড়িয়া দ্যাখো চলে কী না।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা চরিত্রহীনের কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনও দেখা পাও নাই। খুব বড়ো বই হইবে।

চরিত্রহীন যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল।—তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপুর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি'। যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্য আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ'।

শরৎচন্দ্র এই সময়ে যমুনা-সম্পাদককে রেঙ্গুন থেকে যেসব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি পড়লেই বেশ বুঝা যায় যে, পাথর-চাপা উৎসের মুখ থেকে কেউ পাথর সরিয়ে দিলে উৎস যেমন কিছুতেই আর নিজের উচ্ছসিত গতি সংবরণ করতে পারে না, শরৎচন্দ্রের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। অনেক দিন চেপে-রাখা সাহিত্যের উন্মাদনা আবার নূতন মুক্তির পথ পেয়ে

শরৎচন্দ্রকেও এমনি মাতিয়ে তুলেছিল যে যমুনার ভালোমদের জন্যে যেন সম্পাদকের চেয়ে তারই দায়িত্ব ও মাথাব্যথা বেশি! একলাই প্রত্যেক সংখ্যার সমস্তটা লিখে ভরিয়ে দিতে চান এবং একাধিকবার তা দিয়েছেনও। এমনকী কেবল গল্প নয়, কবিতা ছাড়া বাকি প্রত্যেক বিষয় নিয়ে কলম চালাবার ইচ্ছাও তার হয়েছিল। মাঝে মাঝে ছদ্মনামে তিনি সমালোচনা পর্যন্ত লিখতে ছাড়েননি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে নারীর লেখা ও 'কানকাটা' নামে প্রবন্ধ দুটি; যুক্তিসঙ্গত মতামত, সতেজ ভাষা এবং হাস্য ও বিদুপরসের জন্যে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে মনে রাখবার মতো; কিন্তু তার গ্রন্থাবলীতে ওদুটি রচনা এখনও পুনর্মুদ্রিত হয়নি।

'যমুনা'য় প্রথমেই বেরুল শরৎচন্দ্রের নূতন গল্প 'রামের সুমতি'। এ গল্পটির ভিতরে ছিল জনপ্রিয়তার অপূর্ব উপাদান এবং শরৎচন্দ্রের পরিপক্ক হাতের লিপিকুশলতা। তার উপরে 'রামের সুমতি'র আর একটি মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, সার্বজনীনতায় সে অতুলনীয়। কারণ 'রামের সুমতি' কেবল বয়স্ক পাঠকের উপযোগী নয়, তাকে অনায়াসেই শিশুসাহিত্যেরও সমুজ্জ্বল কোহিনুর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবির্ভাবের জন্যে এমন আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শরৎচন্দ্র নিজের আশ্চর্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই একটিমাত্র গল্প সর্বশ্রেণীর পাঠককে বুঝিয়ে দিলে যে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন এক অসাধারণ প্রতিভার উদয় হয়েছে।

সেদিনের কথা মনে আছে। তখন 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'নবভারত' প্রভৃতি প্রধান পত্রিকায় লিখে অল্পবিস্তর নাম কিনেছি—অর্থাৎ সম্পাদকরা লেখা পেলে বাতিল করবার আগে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেন। কিন্তু রামের সুমতি পড়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারলুম না। একেবারে এত শক্তি নিয়ে কী করে তিনি দেখা দিলেন? সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছ থেকে

খোঁজ নেবার চেষ্টা করলুম—কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কোথায় থাকেন, কী করেন? অনুসন্ধানে জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ লেখক হননি, ১৩১৪ সালে তারই লেখনীজাতা বড়দিদি 'ভারতী'র আসরে গিয়ে হাজিরা দিয়েছে। মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, কলম ধরেই কেউ পুরোদস্তুর লেখক হতে পারে না; 'রামের সুমতি'র শরৎচন্দ্র সেই সংস্কারের মূল আলগা করে দিয়েছিলেন। এখন আশ্বস্ত হয়ে বুঝলুম, শরৎচন্দ্র নূতন লেখক নন—'রামের সুমতি'র পিছনে আছে আত্মসমাহিত সাধকের বহুদিনের গভীর সাধনা! আর্টের আসর আর ম্যাজিকের আসর এক নয়—এক মিনিটে এখানে ফলন্ত আমগাছ মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে না।

১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই শরৎচন্দ্র যমুনা তথা বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন পূর্ণ উদ্যমে। ওই প্রথম সংখ্যাতেই বেরুল তার পুরাতন ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস 'চন্দ্রনাথ', নবলিখিত ক্রমপ্রকাশ প্রবন্ধ 'নারীর মূল্য' ও সদ্যরচিত বড়ো গল্প 'পথনির্দেশ'। নারীর মূল্যের নূতন রকম নবযুগের উপযোগী জোরালো যুক্তি এবং পথনির্দেশের লিপিকুশলতা আবার সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। (যদিও জনপ্রিয়তার হিসাবে এ গল্পটি 'রামের সুমতি'র মতন সাফল্য অর্জন করেনি)। শ্রাবণ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করলে বিন্দুর ছেলে। এ গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার আর তুলনা নেই এবং এর পরে কথাসাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়, সে-সম্বন্ধে কারুর মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

১৩২০ সালের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১। নারীর মূল্য' সম্পর্কীয় পাঁচটি প্রবন্ধ, ২। কানকাটা (প্রতিবাদ বা সমালোচনা), ৩। গুরুশিষ্য-সংবাদ (প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাত্মকনাট্য-চিত্র), ৪ পথনির্দেশ(বড়োগল্প), ৫ বিন্দুর ছেলে (বড়োগল্প), ৬। পরিণীতা (বড়োগল্প), ৭। চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) ও ৮ চরিত্রহীন (উপন্যাস)।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। 'রামের সুমতি' বেরুবার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত) একদিন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে ওই গল্পটি পড়ে শুনিয়ে এসেছেন। বিজয়বাবু প্রশংসায় একেবারে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন। এবং তার মুখে শুনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রামের সুমতি পাঠ করে অভিভূত হয়ে যান। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় মহাসমারোহে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের উদ্যোগ-পর্ব চলছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে ভারতবর্ষের লেখকরূপে পাবার জন্যে আগ্রহবান হন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন একটি শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় চলছিল এবং সেখানকার সভ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরিচিত ব্যক্তি। তিনি শরৎচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলালের আগ্রহের কথা জানালেন এবং তার ফলে লাভ করলেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসের প্রথম অংশের পাণ্ডুলিপি। সকলেই জানেন, 'চরিত্রহীন' কোনওকালেই রুচিবাগীশদের মানসিক খাদ্যে পরিণত হতে পারবে না। রুচিবাগীশ বলতে যা বোঝায় দ্বিজেন্দ্রলাল তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তার কিছু আগেই তিনি করেছিলেন কাব্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধঘোষণা। কাজেই তার নূতন কাগজে তিনি চরিত্রহীন প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। চরিত্রহীন বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে যমুনায় বেরুতে আরম্ভ করে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্যে শরৎচন্দ্র মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন, সেটা তখনকার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে প্রকাশ না করে পারেননি। কিন্তু সেজন্যে আত্মশক্তির উপরে তার নিজের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি কিছুমাত্র। 'যমুনা'তে যখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হতে থাকে তখনও একশ্রেণীর লোক তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন—অটল।

১৩২০ সালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে-সময়ে 'যমুনা'র আফিস উঠে এসেছে ২২১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। শ্রীমানী

মার্কেটের সামনে এখন যেখানে ডি. রতন কোম্পানির আলোক-চিত্রালয়, ওইখানে ছাদের উপরে সতরঞ্চ বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় বসত 'যমুনা'র সাহিত্য-আসর। শরৎচন্দ্রকেও সেখানে দেখা যেত প্রত্যহ। ওখানকার কিছু কিছু বিবরণ পরিশিষ্টে মৎলিখিত শরতের ছবির মধ্যে পাওয়া যাবে।

এবারে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন বিজয়ীর বেশে! যমুনায় প্রকাশিত রচনাবলী তখন তাকে সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছে এবং যমুনা-কার্যালয় থেকেই গ্রন্থাকারে তার প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিদিনই নব নব অপরিচিত ভক্ত একান্ত সুপরিচিতের মতন আসেন তার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হতে এবং আরও আসেন মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতন প্রকাশকের দল। চারিদিক থেকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের অন্ত নেই। শরৎচন্দ্র এবারে এসে বাসা বেঁধেছিলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের এক মোড়ে। সেই বাসা তুলে দিয়ে আবার যখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর তাকে কেরানিগিরি করে সুদূর প্রবাসে জীবনযাপন করতে হবে না! মানুষের পক্ষে এই সফল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি কী সুমধুর!

হলও তাই। পর-বৎসরেই কেরানি শরৎচন্দ্র হলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এবং তখন তার জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পেলেন সর্বপ্রথমে 'যমুনা'-আসরেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার,—এখন 'রায় এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের শেষ পুস্তক ছেলেবেলার গল্প প্রকাশেরও অধিকার পেয়েছেন ওই সুধীরবাবুই।

ওই সময়ে শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা কতখানি চরমে উঠেছিল, একটিমাত্র ঘটনাই তা প্রমাণিত করবে। এম.সি. সরকার থেকে যখন চরিত্রহীন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, তখন সেই সাড়ে তিন টাকা দামের গ্রন্থ প্রথম দিনেই সাড়ে চার শত খণ্ড বিক্রি হয়ে যায়! আর কোনও বাঙালি লেখক বাংলাদেশের

পাঠকসমাজের ভিতরে প্রথম দিনেই এত মোটা প্রণামী পেয়েছেন বলে শুনিনি। পরে তার পথের দাবি নাকি এর চেয়েও বেশি আদর পেয়েছিল!

গৌরবময় সাহিত্যজীবন

শরৎচন্দ্রের মতন বৃহৎ প্রতিভা 'যমুনা'র মতন ছোটো পত্রিকায় বেশিদিন বন্দি থাকবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য শরৎচন্দ্র যদি 'যমুনা'কে ত্যাগ না করতেন, তাহলে 'যমুনা' যে কেবল আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকত তা নয়, আকারে ও প্রচারে আজ সে হয়তো বিপুল হয়ে উঠতে পারত; কারণ ১৩২০ সালেই তার গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল আশাতীত। কিন্তু 'যমুনা' বেশিদিন আর শরৎচন্দ্রকে ধরে রাখতে পারলে না। 'যমুনা'র সম্পাদকরূপে পরে শরৎচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হল বটে, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' তার সবল বাহু বাড়িয়ে তখন শরৎচন্দ্রকে টেনে নিয়েছে। সম্পাদক শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পসার বেশি। তার সমস্ত নূতন রচনা 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হতে লাগল।

'যমুনা'র সর্বনাশ হল বটে, তবে শরৎচন্দ্রের দিক থেকে এটা হল একটা মঙ্গলময় ঘটনা। কারণ 'যমুনা' ধনীর কাগজ ছিল না, শরৎচন্দ্রকে সে কোনওরকম অর্থসাহায্য করতে পারত না। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বপ্রধান প্রকাশক এবং তাদের নিয়মিত অর্থসাহায্যের উপরেই নির্ভর করে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র দাসত্ব ত্যাগ করে সাহিত্যজীবনকেই গ্রহণ করলেন একান্তভাবে। শরৎচন্দ্রের মতন শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়ে 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা যে বঙ্গসাহিত্যেরই উপকার করলেন, এ সত্য মানতেই হবে। এবং এইখানেই স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের কথা মনে ওঠে। কারণ শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র বড়ো আসরে হাজির করবার জন্যে তিনি যথেষ্ট—এমনকী প্রাণপণ চেষ্টাই করেছিলেন।

যমুনায় কথাসাহিত্যের যে উৎসব আরম্ভ, 'ভারতবর্ষে'র মস্ত আসরে স্থানান্তরিত হয়ে তার সমারোহ বেড়ে উঠল। শরৎচন্দ্র তখন বাংলা সাহিত্যের জন্যে নিজের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করলেন, তার লেখনীর মসী-ধারা অকস্মাৎ যেন

প্রপাতে পরিণত হতে চাইলে বিপুল আনন্দে! সে তো বেশিদিনের কথা নয়, আজও অধিকাংশ পাঠকের মনেই তখনকার সেই বিস্ময়কর মহোৎসবের স্মৃতি নিশ্চয়ই বিচিত্র রঙের রেখায় আঁকা আছে! মোপাসাঁর সাহিত্যজীবনের মতো শরৎচন্দ্রের নবজাগ্রত সাহিত্যজীবনও প্রধানত একযুগের মধ্যেই মাতৃভাষার ঠাকুরঘরে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল। প্রতি মাসে নব নব উপহার—নব নব বৈচিত্র্য—নব নব বিস্ময়! পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ওই তো এক রোগজীর্ণ শীর্ণদেহ অতি সাধারণ ছটফট মানুষ, যার মুখে ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদেরও মতো বড়ো বড়ো বুলি শোনা যায় না, বিদ্বানদের সভায় গিয়ে যিনি দুটো লাইনও গুছিয়ে বলতে পারেন না, রাজপথের জনপ্রবাহের মধ্যে যিনি কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, তার মধ্যে কেমন করে সম্ভব হল এই মহামানুষোচিত শক্তির প্রাবল্য, নরজীবন সম্বন্ধে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে এই উদার উচ্চধারণা, সংকীর্ণ প্রচলিতের বিরুদ্ধে এই সগর্ব বিদ্রোহিতা এবং কল্পনাতীত সৌন্দর্যের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

কেবল 'ভারতবর্ষ' নয়, পরে মাঝে মাঝে 'বঙ্গবাণী' 'নারায়ণ' ও 'বিচিত্রা' প্রভৃতি আসরে গিয়েও শরৎচন্দ্র দেখা দিয়ে এসেছেন। তার কোনও কোনও উপন্যাস একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে(যেমন বামুনের মেয়ে), কোনও কোনও উপন্যাস সমাপ্ত হয়নি, কোনওখানির পাণ্ডুলিপি নষ্টও হয়ে গিয়েছে (যেমন 'মালিনী')। 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস বা গল্পগুলি লিখেছিলেন : বিরাজ-বৌ, পণ্ডিতমশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, স্বামী,মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, শ্রীকান্ত (১ম, ২য়,৩য় ও ৪র্থ পর্ব) দত্ত, পল্লীসমাজ, মালিনী, অরক্ষনীয়া, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, মানুনের মেয়ে, নববিধান, হরিলক্ষ্মী, মহেশ, পথের দাবি, শেষ-প্রশ্ন, বিপ্রদাস, জাগরণ (অসমাপ্ত), অনুরাধা, সতী ও পরেশ, আগামী কাল (অসমাপ্ত), শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত), এবং ভালোমন্দ (১ম পরিচ্ছেদ)। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখেছেন। শেষের দিকে

শিশুসাহিত্যেরও প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল,কিন্তু এ-বিভাগে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করবার আগেই তাকে মহাকালের আহানে সাড়া দিতে হয়েছে। তিনি অনেক পত্র রেখে গেছেন, তারও অনেকগুলির মধ্যে শরৎ-প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ আছে এবং একত্রে প্রকাশ করলে সেগুলিও সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্যে গল্প নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে একখানি সই-করা চেক পাঠিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু লিখেছিলেন—আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুশিমতো অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন। ...সাধারণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রও হয়তো বোকার মতন কাজ করেছিলেন,—কারণ নিজের অসাধারণতার মূল্য নিরূপণ করেছিলেন তিনি মাত্র একশো টাকা!

বর্তমান ক্ষেত্রে শরৎসাহিত্য নিয়ে আমরা কোনও কথা বলতে চাই না, কারণ শরৎচন্দ্র পরলোকে গমন করলেও তার অস্তিত্বের স্মৃতি এখনও আমাদের এত নিকটে আছে যে, সমালোচনা করতে বসলে আমরা হয়তো যথার্থ বিচার করতে পারব না; লেখনী দিয়ে হয়তো কেবল প্রশংসার উচ্ছাসই নির্গত হতে থাকবে, কিন্তু তাকে সমালোচনা বলে না। এবং এখন উচিত কথা বলতে গেলেও অনেকের কাছে তা অন্যায়-রকম কঠোর বলে মনে হতে পারে। সুতরাং ও-বিপদের মধ্যে না যাওয়াই সঙ্গত।

অতঃপর বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই।

তাঁর যে-উপন্যাস নাট্যাকারে সর্বপ্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে 'বিরাজ-বৌ'। নাট্যরূপদাতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যমঞ্চ ছিল 'স্টার থিয়েটার'। যশস্বী নট-নটীরাই এই

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে 'বিরাজ-বৌ'য়ের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয়নি।

তারপর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন মনোমোহন নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন ভারতী-সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র পুরানো বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কীয় একখানি নূতন নাটক লেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে নাচঘর সম্পাদক সেই সুখবর জনসাধারণেরও কাছে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। শিশিরকুমার সে-সময়ে 'ভারতী'র আসরে নিয়মিতরূপে হাজিরা দিতেন। নূতন নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তিনি জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন বলেও স্মরণ হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের নিজেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তিনি নাটক লিখতে পারেন। এবং তার সাহিত্যিক বন্ধুদেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যার উপন্যাসে এত নাটকীয় ক্রিয়া, সংলাপ ও ঘটনা-সংস্থান আছে, তার লেখনী নিশ্চয়ই নাট্য-সাহিত্যকে নূতন ঐশ্বর্য দান করতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত কারুর বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হল না। যদিও এখনও আমাদের বিশ্বাস আছে যে, নাটক লিখলে শরৎচন্দ্রের লেখনী বিফল হত না। - শিশিরকুমার তখন নাট্যমন্দিরে বসে নূতন নাটকের অভাব অনুভব করছেন এবং থিয়েটারি নাট্যকারদের তথাকথিত রচনা তার পছন্দ হচ্ছে না। ওদিকে 'ভারতী' ইতিমধ্যে আবার শ্রীমতী সরলা দেবীর হস্তগত হয়েছে। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা উপন্যাসকে 'ষোড়শী' নামে নাট্যাকারে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখে শিশিরকুমার তখনই শরৎচন্দ্রের আশ্রয় নিলেন। শরৎচন্দ্রের হস্তে পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে 'ষোড়শী' নাট্যমন্দিরের পাদ-প্রদীপের আলোকে দেখা দিয়ে কেবল সফলই হল না, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করলে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র আর একবার উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, এইবারে আমি মৌলিক নাটক লিখব? কিন্তু তার সে উৎসাহও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

'ষোড়শী'র সাফল্য দেখে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত আরও অনেকগুলি নাটক একাধিক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে গ্রহণ ও অভিনয় করা হয়েছিল, যথা—'পল্লীসমাজ' 'বারমা', 'চন্দ্রনাথ', 'চরিত্রহীন', 'অচলা' ও 'বিজয়া' প্রভৃতি। অভিনয়ের দিক দিয়ে কোনওখনিই ব্যর্থ হয়নি। যদিও নাটকত্বের দিক দিয়ে সবগুলি সফল হয়েছে বলা যায় না—বিশেষত চরিত্রহীন । বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের আর কোনও উপন্যাসের নাট্যরূপই 'ষোড়শী'র মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

বাংলার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। এ বিভাগেও সর্বাগ্রে শরৎচন্দ্রকে পরিচিত করেন শিশিরকুমার, তার আঁধারে আলোর চিত্ররূপ দেখিয়ে। তারপর নানা চিত্র-প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সাহায্যে অনেকগুলি ছবি (সবাক বা নির্বাক) তৈরি করেছেন, যথা—'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' (সবাক ও নির্বাক), 'স্বামী', 'শ্রীকান্ত', 'পল্লীসমাজ', 'দেনা পাওনা', 'বিজয়া', 'চরিত্রহীন' ও 'পণ্ডিতমশাই'। এদের মধ্যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'। অন্যগুলি অল্পবিস্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু সকলকার উপরে টেক্কা দিয়েছে সবাক 'দেবদাস', কী চিত্রকথা হিসাবে আর কী চিত্রশিল্প হিসাবে সে অতুলনীয়! চলচ্চিত্র জগতে আনাড়ি পরিচালকের পাল্লায় পড়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দান কলঙ্কিত হয়েছে বারংবার সাধারণ রঙ্গালয়ে তা এতটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি কখনও। তার প্রধান কারণ, সাহিত্যশিক্ষাহীন বাঙালি পরিচালকদের দৃঢ় ধারণা, গল্পলেখকদের চেয়ে তারা ভালো করে গল্প বলতে পারেন। এই মূখোচিত ধারণার কবলে পড়ে বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নাম বহুবার অপমানিত হয়েছে। যারা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে মানে না, সেসব হতভাগ্যের কাছে অন্যান্য লেখকরা তো নগণ্য! কিন্তু শরৎচন্দ্রের নাম রেখেছে 'দেবদাস',—যদিও চলচ্চিত্রজগতে মনস্তত্ত্ব-প্রধান কোনও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরই মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করি

না। শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যরূপলাভের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার কোনও কোনও মানসসন্তান ইতিমধ্যেই ছবিতে হিন্দি কথা কয়েছে, ভবিষ্যতে আরও অনেকেই কইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা ইউরোপের ও ভারতের নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে, এখানে তাদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবার ঠাই নেই। আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে তিনি হয়তো নোবেল-পুরস্কার পেয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিস্মিত চিত্ত আকর্ষণ করতে পারতেন।

একদৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ততটা দেখে নিয়েছি বোধহয়। যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্রো একটুখানি ঠাঁই জোটেনি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল করে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ি, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লি-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন, একদিন যারা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাননি, তারাই এখন তার কাছে ছুটে এসে বন্ধু বা আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত হবেন, এটা কেহই কল্পনা করতে পারেননি বটে, কিন্তু এসব খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কারণ এমন ব্যাপার আরও বহু প্রতিভাহীন ও বিদ্যাহীন ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই শরৎচন্দ্রের জীবনে আলাদীনের প্রদীপের মতন কাজ করেছে বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য গরিবকে দুদিনে ধনী করে তুলেছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বড়ো বড়ো বাঙালি সাহিত্যিকদের দিকে তাকিয়ে কী দেখি? দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন জমিদার। হেমচন্দ্র যত দিন ওকালতি করতেন, কবিতা লিখতেন নির্ভাবলায়; কিন্তু অন্ধত্বের জন্যে ওকালতি ছাড়বার পর তাকে পরের কাছে হাত পেতে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছে। এবং সাহিত্য অত বড়ো

প্রতিভাবান মাইকেলকে কোনও সাহায্যই করেনি—হাসপাতালে গিয়ে তিনি মারা পড়েছেন একান্ত অনাথের মতো। বাংলাদেশের বড়ো সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই কেবল সাহিত্যের জোরে দুই পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন,—ভারতীর পুরোহিত হয়েও লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে করেছেন হস্তগত!

নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি ও নিজের টাকার কাড়ির গর্বে শরৎচন্দ্র একদিনের জন্যেও একটুও পরিবর্তিত হননি, তার মুখে কেউ কোনওদিন দেমাকের ছায়া পর্যন্ত দেখেনি। সাদাসিধে পোশাকে, সরল হাসিমাখা মুখে, বিনা অভিমানে তিনি আগেকার মতোই আলাপীলোকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন, যারা তাকে চিনত না তার কথাবার্তা শুনেও তারা বুঝতে পারত না যে তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত অমর সাহিত্যস্রষ্টা! ভানই যাদের সর্বপ্ন সেই পুঁচকে লেখকরা শরৎচন্দ্রকে দেখে কত শিক্ষাই পেতে পারে!

রেঙ্গুন থেকে চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র কয়েক বৎসর শিবপুরে ভাড়া করে বাস করেন। কিন্তু শহরের একটানা ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে শেষটা তিনি রূপনারায়ণের রূপের ধারায় ধোয়া পানিত্রাসে (সামতাবেড়) নিরালা পল্লি-আবাস বানিয়ে সেইখানেই বাস করতে থাকেন। বাগানে ঘেরা দোতলা বাড়ি, লেখবার ঘরে বসে নটিনী নদীর নৃত্যলীলা দেখা যায়; পল্লিকথার অপূর্ব কথকের পক্ষে এর চেয়ে মনোরম স্থান আর কোথায় আছে? কখনও লেখেন, কখনও পড়েন, কখনও ভাবেন; কখনও বাগানে গিয়ে ফুলের চারা আর ফলের গাছের সেবা করেন; কখনও পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে যত্নে পালিত মাছদের আদরে ডেকে খাবার খেতে দেন; কখনও গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে পল্লিবাসীদের কুশল-সংবাদ নেন এবং পীড়িতদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে আসেন। এই ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে আদর্শ জীবন!

কিন্তু যাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র জনতার শ্রেণী, বহুজনধাত্রী কলিকাতা নগরীও মাঝে মাঝে বোধহয় তাঁকে প্রাণের ডাকে ডাকত। তাই শেষ-জীবনে

বালীগঞ্জেও তিনি একখানি বড়ো বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর তার স্নেহ শহর ও পল্লির মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

এবং শহরেও ছিল তাঁর আবাসে সকলের অবারিত দ্বার। আগন্তুকদের ভয় দেখাবার জন্যে বড়োমানুষীর দিনেও তার দেউড়িতে লাঠি-হাতে চাপদাড়ি দারোয়ান বসেনি কোনওদিন। তাই শরৎচন্দ্রের প্রশস্ত বৈঠকখানার ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত দেশবিখ্যাত নেতা, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পাশে নিতান্ত সাধারণ অখ্যাত লোকদের; হোমরা-চোমরা মোটরবিলাসী বাবুগণের পাশে কপর্দকহীন মলিনবাস দরিদ্রদের; পক্ককেশ গভীরমুখ প্রাচীনবৃন্দের পাশে ইশকুলের অজাতশত্রু চপল ছোকরাদের! শরৎচন্দ্র ছিলেন সমগ্র মানবজীবনের চিত্রকর, তাই কোনওরকম মানুষকেই তিনি ত্যাগ করতে পারতেন না—তিনি ছিলেন প্রত্যেকেরই বন্ধু, তাই সবাই এসে র্তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। সেইজন্যেই আজ তার মৃত্যুর পরে অগুনতি মাসিকে, সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে স্মৃতিকথার আর অন্ত নেই, যিনি তাকে একদিন দুদণ্ডের জন্যে দেখেছেন, তিনিও শরৎ-কাহিনি লিখতে বসে গেছেন প্রবল উৎসাহে এবং তিনিও এই ভাবটাই প্রকাশ করেছেন যে শরৎচন্দ্র তাকে, একান্ত স্বজনেরই মতনু ভালোবাসতেন! হয়তো সেইটেই আসল সত্য, বিরাট বিশ্বের বৃহৎ আকাশ থেকে ছোট্ট তৃণকণার প্রেমে যিনি হাসতে-কাদতে নারাজ। সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া তার কাজ নয়!

তাঁর গোপন দান ছিল অনেক। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অভাব ও দীনতার হাহাকারে, তাই পরের দুঃখে তিনি অটল থাকতে পারতেন না। অনেক সময়ে ভিখারির হাতে একমুঠো সিকি দুআনি আনি ঢেলে দিয়েছেন দেশের ডাকে হাসিমুখে যারা শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়েছে, তাদের পরিবারের অসহায়তার কথা ভেবে সমবেদনায় তাঁর প্রাণ ছটফট করত। তাই বহু রাজবন্দির পরিবারে গিয়ে পৌঁছোত তার অযাচিত অর্থসাহায্য। শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন দেশের কাজে অগ্রণী:দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও

সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই কংগ্রেসের কাজে মেতে উঠতেন। শেষের দিকে শরীর ভেঙে পড়াতে এদিকে হাতেনাতে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকত জাতীয় কর্মক্ষেত্রেই। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখবার ধারা ছিল একটু স্বতন্ত্র। বহু নবীন লেখককে জানি, যারা বড়ো বড়ো লেখকের রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করেন। এটা ভুল। কারণ প্রত্যেক লেখকেরই মনের গড়ন বিভিন্ন, তাই তাদের রচনাপ্রণালীও হয় ব্যক্তিগত। শরৎচন্দ্র আগে প্লট বা আখ্যানবস্তু স্থির করতেন না, আগে বিষয়বস্তু ও তার উপযোগী চরিত্রগুলিকে মনে মনে ভেবে রাখতেন, তারপর ঠিক করতেন তারা কী কী কাজ করবে। গতযুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বঙ্কিম-সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র আগে মনে-মনে করতেন ঘটনা-সংস্থান। শরৎচন্দ্রের আর এক নূতনত্ব ছিল। প্রায়ই তার মুখে শুনেছি যে, মনে-মনে নূতন উপন্যাসের কল্পনা স্থির হয়ে গেলে তিনি নাকি গোড়ার দিক ছেড়ে শেষাংশের বা মধ্যাংশের দু-চারটে পরিচ্ছেদ আগে থাকতে কাগজে-কলমে লিখে । রাখতে পারতেন। তার চরিত্রহীনের একাধিক বিখ্যাত অংশ এইভাবে লেখা!

শরৎচন্দ্রের ঝরঝরে লেখা দেখলে মনে হয়, ভাষা যেন অনায়াসে তার মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আসলে তিনি দ্রুত লেখকও ছিলেন না এবং খুব সহজে লিখতেও পারতেন না এবং লেখবার পরেও অনেক কাটাকুটি করতেন। বেশ ভেবে-চিন্তে বাক্যরচনা করতেন। বর্তমান জীবনী-লেখক 'যমুনা'র যুগে রচনায় নিযুক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন একাধিকবার। তখন তার মনে হয়েছিল, লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্র যেন বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা

ভোগ করছেন এবং প্রত্যেক ভালো লেখকেরই পক্ষে এইটেই হয়তো স্বাভাবিক! রচনাও তো জননীর প্রসব-বেদনার মতো;—যন্ত্রণাময় অথচ আনন্দময়!

যশস্বী হয়ে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য সম্পাদকের লেখার জন্যে তাগাদা সহ্য করেছেন, অটলভাবে এবং অম্লানবদনে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মতো তাগাদার চোটে সহসা যা তা একটা কিছু লিখে দিয়ে কারুকে কখনও তিনি খুশি করতেন না। সম্পাদকরা রাগ করবেন বলে তিনি সাহিত্যের অপমান করতে রাজি ছিলেন না—টাকার লোভেও নয়! কথিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা ছিল শরৎচন্দ্রের মতবিরুদ্ধ। এ ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন কদাচ। এ-বিষয়ে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন। কথ্যভাষার সুদৃঢ় দুর্গ ভারতী' আসরেও গিয়ে তিনি বহুবার নিজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

সাহিত্যসেবার জন্যে তার ভাগ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জগত্তারিণী পদক'। এ-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু, পুস্তকের প্রকাশক ও মৌচাকসম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন; সভা-সমিতিকে তিনি বর্জন করিয়া চলিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে-বারে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে র্তাহাকে 'জগত্তারিণী মেডেল দেওয়া হয়, সেইবারের কনভোকেশনের দিনে মেডেল দিবার সময়ে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মেডেল পরিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাই সেইদিন তিনি আমাদের দোকানের নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। আমরা জানি, সর্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রকে যেদিন একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি করা হয়, সেদিনও তিনি সুধীরচন্দ্রের পুস্তকালয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এমন লুকোচুরি করে ছিনেজোক সভাওয়ালাদের কতদিন আর ফাকি দেওয়া যায়? শেষের দিকে শরৎচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে সভার অত্যাচার সহ্য করতে হত, কিন্তু তার লাজুক ভাব কোনওকালেই যায়নি। আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এই রকম সভা-ভীতি দেখেছি। তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার ব্যাপারে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রেরও চেয়ে পশ্চাৎপদ!

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। মৃত্যুর অনতিকাল আগে এই ডক্টর উপাধি লাভ করে হয়তো তিনি যথেষ্ট সান্তনা লাভ করেছিলেন—যদিও তার প্রতিভার মূল্য ওই উপাধির চেয়ে ঢের বেশি। উপাধি মানুষকেই বড়ো করে, প্রতিভাকে নয়।

১৩৩৯ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন-হলে 'শরৎ-জয়ন্তী'র আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে একশ্রেণীর লোক এমন অশোভন কাণ্ড করেছিল যা ভাবলে আজও লজ্জা পেতে হয়! এর আগে ও পরে জীবনে আরও বহু বৃহৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সম্মানলাভ করেছেন, কিন্তু এখানে তার ফর্দ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি, কারণ ওসব শোভা পায় সুবিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের যা বলবার তা মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। তবে সাধারণ পাঠক হয়তো তার আরও কোনও কোনও পরিচয় পেতে চাইবেন। এখানে তাই আরও কিছু বলা হল। যারা এর চেয়েও বেশি কিছু চাইবেন, পরিশিষ্ট অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

জীবজন্তুদের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলেবেলাতেও তিনি বাক্সে করে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্যা করতেন নিজের হাতে। কোনও বাড়ির উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলাফেরা করতে দেখলে তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন— যদি সে পড়ে যায়! পাখি, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তার পোষা দেশি কুকুর ভেলু তো প্রায়-অমর হয়ে উঠেছে! 'যুবরাজ', 'বংশিবদন' প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন! কেবল ভেলু নয়, যে-কোনও

পথচারী কুকুর ছিল তার স্নেহের পাত্র। নিজের মোটরচালককে বলা ছিল, পথে যদি কখনও সে কুকুর চাপা দেয়, তাহলেই তার চাকরি যাবে! তাঁর এই কুকুর-প্রতি দেখলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের লাইন মনে হয়

কত রূপ স্নেহ করি
দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!

ভেলুর কয়েকটি গল্প পরিশিষ্টে শরতের ছবিতে দেওয়া হল। পাণিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাকে চিনত। দুটি মাছ আবার তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। একবার বর্ষায় রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছ দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে তার দুঃখ কত! তার বাগানের একটি গর্তে দুটি বেজি তাদের বাচ্চা নিয়ে বাস করত। গায়ের এক ছেলে সেই বাচ্চাটিকে চুরি করে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর করে বাচ্চাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র যা তা খেলো কাগজে লিখতে পারতেন না। আর কোনও লেখককেই তার মতন নিয়মিতভাবে দামি কাগজে লিখতে দেখিনি। লেখার সরঞ্জাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই শৌখিনতা রচনার প্রতি তাঁর পবিত্র নিষ্ঠাকে প্রকাশ করে। তাঁর হাতে বরাবরই ফাইন্টেন পেন দেখেছি, যখন ও-পেনের চলন হয়নি, তখনও। তিনি খুব বড়ো ও মোটা কলম ও সূক্ষ্ম নিব ব্যবহার করতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দামি ফাউন্টেন পেন উপহার দিতে তিনি ভালোবাসতেন। তার হাতের লেখার ছাদ ছোটো হলেও চমৎকার ছিল। যেন মুক্তার সারি। তামাক

ছাড়া তার একদণ্ড চলত না। লেখবার সময়েও গড়গড়ায় তামাক খেতেন। কেউ তাকে গড়গড়া উপহার দিলে খুশি হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুও ছিলেন গড়গড়ার এমনি ভক্ত। তিনি চায়েরও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। অনেক দিনই তাকে আট-দশ পিয়ালা চা-পান করতেও দেখা গিয়েছে। তার একটি বদ-অভ্যাস ছিল—আফিম খাওয়া।

তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। কখনও চেয়ারের উপরে দু' পা তুলে ফেলতেন, কথা কইতে কইতে কখনও মাথার চুলের ভিতরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতেন, কখনও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একবার পায়চারি করে আসতেন। সভাপতিরূপেও এ অস্থিরতা তিনি নিবারণ করতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে গরদের জাম-কাপড়-চাদর পরতেন বটে, কিন্তু কোনওদিনই তিনি ফিটফট পোশাক বাবু হতে পারেননি। বেশির ভাগ সময়েই আটপৌরে জাম-কাপড়ে একছুটে বেরিয়ে পড়তেন। একসময়ে তালতলার চটি ছাড়া আর কোনও জুতো পরতেন না। বাড়িতে তাকে হাত-কটা জামা পরে থাকতে দেখেছি।

যৌবন-সীমা পার হবার আগেই তিনি নিজেকে বুড়ো বলে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। একবার হাওড়ার এক সভায় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি নিজের প্রাচীনতার গর্ব প্রকাশ করেন। তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত মুখে সেদিন মৃদু কৌতুকহাস্য লক্ষ করেছিলুম! তার আগেকার অধিকাংশ পত্রেই এই কল্পিত বৃদ্ধত্বের দাবি দেখা যায়!

প্রকাশ্য সাহিত্যজীবনের প্রথম কয় বৎসর এই সব জায়গায় গিয়ে তিনি প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'যমুনা' কার্যালয়ে ও পরে 'মর্মবাণী' কার্যালয়ে; সুকিয়া স্ট্রিটে 'ভারতী' কার্যালয়ে; গুরুদাস অ্যান্ড সন্সের দোকানে; রায় এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের দোকানে; ৩৮নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায়, এবং শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের

আলয়ে। শেষ-জীবনে তাকে আর কোনও সাহিত্য-বৈঠকে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে তিনি একাধিক থিয়েটারি আসরে (প্রায়ই দর্শকরূপে নয়) উপরি-উপরি হাজিরা দিতেন।

পানিত্রাসে যেসব সাক্ষাৎপ্রার্থী গিয়ে উপস্থিত হতেন, তারা ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্রের অতিথি-সৎকারে অভিভূত হয়ে। তিনি পরমাত্মীয়ের মতো সকলকে ভালো করে না খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। বিংশ-শতাব্দীর অতি আধুনিক লেখক হলেও মানুষ-শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেকেলে হিন্দু-স্বভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠত।

আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই নিজেদের কোনও বিশেষ দলভুক্ত বলে মনে করেন এবং এটা সগর্বে প্রচারও করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বরাবরই ছিলেন দলাদলির বাইরে। প্রাচীন ও আধুনিক সব দলেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে মিশেছেন একান্ত অন্তরঙ্গের মতো, কিন্তু কোথাও গিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলেননি, বা কোনও দলের বিশেষ মনোভাব র্তার মনকে চাপা দিতে পারেনি। কেবল তাই নয়। তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আত্মাভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি নিজেও কোনও দলগঠন করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে 'শরৎচন্দ্রের দল' বলে কোনও দল নেই। অথচ এমন দলসৃষ্টি করা তার পক্ষে ছিল অত্যন্ত সহজ।

ভবিষ্যতের ইতিহাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন স্থাপন করবে কত উচ্চে, আজ তা কল্পনা করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও তার মাঝখানে যে অন্য কারুর ঠাঁই হবে না, এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। এবং শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কাহিনি যে সুদূর ভবিষ্যৎ যুগকেও বিস্মিত করবে সে-বিষয়েও সন্দেহ করবার কারণ নেই। এখন বাকি রইল শরৎচন্দ্রের শেষ রোগশয্যার কথা। সেটা নিজে না বলে এখানে বাতায়নে'র বিবরণী উদ্ধার করে দিলুম

'মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে থেকে শরৎচন্দ্রের শরীরে ব্যাধি প্রকট হয়। চিরদিন তিনি বলতেন, শরীরে আমার কোনও ব্যাধি নেই, শুধু অর্শটাই মাঝে মাঝে যা একটু কষ্ট দেয়। অর্শ যে আর সারবে তা আমার মনে হয় না, তা এতদিন ও আমাকে আশ্রয় করে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়) ওর পরম শত্রু। সে বলে, ওকে তাড়াতেই হবে। একথা ওকে আর জানতে দিইনে। জানলে ভয়ে ও এমনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে যে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত করে তুলবে। একেই তো ওকে খুশি রাখতে দিনে কয়েক ঘণ্টা আমার কাটে, ওর ওপর ও যদি অভিমান করে তাহলে বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা কী হবে!...' অর্শর কথা উঠলে এমনি পরিহাসই তিনি করতেন।

দিন যায়—অর্শ ব্যাধিটি পুরাতন ভৃত্যের মতো তার সঙ্গেই থাকে। একদিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে তাকে তার দেহ থেকে কেটে বার করে দিলেন। তিনি বললেন, বাঁচলুম! এতদিনে সত্যি ও আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু ভয় হয়, প্রতিশোধ নিতে ও কুমুদকে না ধরে।

হঠাৎ তার শরীরে প্রতিদিন জ্বর হতে লাগল আর সঙ্গে কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত এক রকম যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। জ্বরও ছাড়তে চায় না—যন্ত্রণাও যেতে চায় না। একদিন জ্বর গেল, কিন্তু যন্ত্রণা রয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, 'নিউরলজিক পেন' ...নানা চিকিৎসা চলতে লাগল,—শেষে যন্ত্রণারও উপশম হল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে পেটে এক রকম অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। পরীক্ষায় বুঝা গেল পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছে। এ কথা তার কাছে গোপন রাখা হল—ইতিমধ্যে রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে চিকিৎসকেরা রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। এদিকে শরীর তার অত্যন্ত দুর্বল—অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চিকিৎসকেরা বড়ো মুশকিলে পড়লেন। শেষে স্থির হল বাড়ি থেকে (২৪নং অশ্বিনীকুমার দত্ত রোড) তাকে কোনও নার্সিংহোমে রেখে শরীরে যখন

কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই তাকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখে পার্ক স্ট্রিটের একটি ইউরোপিয়ান নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তার বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় ১লা জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে তিনি চলে আসবার জন্যে এমনি জিদ ধরে বসেন যে তাকে অন্য নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা ব্যতীত আর উপায় রইল না। তিনি বলেছিলেন, আমাকে যদি এখান থেকে না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমি মাথা ঠুকে মরব। এখানকার নার্সগুলো আমাকে বড়ো বিরক্ত করে। (মানে তাকে তামাক ও আফিম খেতে দেয় না!)

যেখানে তাকে স্থানান্তরিত করা হল তার নাম হচ্ছে 'পার্ক নার্সিংহোম'। কাপ্তেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরস্থ ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসের ভবনের নীচের তলায় এটি অবস্থিত। এরই ১নং ঘরে তাকে রাখা হল।

এখানে কিছুদিন রাখবার পর বুধবার ১২ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ২॥০ টার সময় অত্যন্ত গোপনে তার পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। এটি ক্যানসারের উপর অস্ত্রোপচার নয়। মুখের মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার শক্তি তাঁর আর ছিল না, অথচ দেহে রক্তের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করে তাকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি একটুও শঙ্কিত ছিলেন না। চিকিৎসকেরা তার জীবনের কোনও আশাই রাখেননি, তাই তারা অস্ত্রোপচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা— অস্ত্রোপচার করতেই হবে। জোর করে বললেন, আমি বলছি তোমরা করো— তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই... ভয় কিসের-I am not a woman.

তার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। এর পর চার দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়ারি ২রা মাঘ, রবিবার, বেলা ১০টার সময় নার্সিংহোমেই তার জীবনলীলার অবসান হয়। বেলা ১১টার সময় তার নিজের মোটরগাড়িতে তাকে তার বাড়িতে

আনা হয়। বৈকালবেলায় ৪টের সময়, এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ তার শবদেহ কেওড়াতলার শ্মশানতীর্থে আনীত হয়। ৫-৪৫ মি. সময়ে তার চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শরৎচন্দ্র মহাপ্রস্থান করেন রবিবার, ২রা মাঘ ১৩৪৪; তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বৎসর দুই মাস মাত্র।

মৃত্যুর পূর্বে শরৎচন্দ্রের শেষ কথা হচ্ছে, আমাকে দাও—আমাকে দাও—আমাকে দাও! ..কে তাকে কী দিতে এসেছিল, কিসের জন্য তার এই অন্তিম আগ্রহ?...শরৎচন্দ্রের মুখ চিরমৌন, শরৎচন্দ্রের লেখনী চির-অচল। তার প্রার্থিত সেই অজ্ঞাত নিধির কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

পরিশিষ্ট

শরতের ছবি

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যের পাঠশালায় আমার হাতমকশো তখন শেষ হয়েছে বোধহয়। 'যমুনা'র সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু না-কিছু লিখি। ...একদিন বৈকালবেলায় যমুনা অফিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি। এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগ ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উষ্কপুষ্ক চুল, একমুখ দাড়ি-গোফ, পরনে আধ-ময়লা জাম-কাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, কাকে দরকার?

—যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।

—ফণীবাবু এখনও আসেননি।

—আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসব কি?

চেহারা দেখে মনে হল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ওই বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, সে কী! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেননি?

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী?

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হল কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ 'যমুনা'য় আমার কেরানী গল্প পড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তারপরেও আমাদের মধ্যে একাধিকবার পত্র-ব্যবহার হয়েছিল। তার দু-একখানি পত্র এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছি।

উপর-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও, 'যমুনা'য় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর-ছয়েক আগে 'ভারতী'তে তার বড়দিদি প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যসমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর যশের ভিত্তি পাকা করে তুলেছিল, ওই তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই—বিশেষ করে 'বিন্দুর ছেলে'। তার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোনও বিখ্যাত মাসিকপত্রের অফিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে 'যমুনা'য় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তার চন্দ্রনাথ ও নারীর মূল্যও তখন 'যমুনা'য় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনও শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মতো আর বেশি কিছু ছিল না। রেঙ্গুনে সরকারি অফিসে নব্বই কী একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউন্টেন্টশিপ একজামিনে পাস করতে পারেননি বলে তার চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি, বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্মি ভাষায় অজ্ঞতার দরুন ওকালতি পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তার পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

কারণ সরকারি কাজে পাকা বা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিকজীবন গ্রহণ করতেন না।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ 'যমুনা'-অফিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তার অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি। সে সময়ে যমুনা-অফিসে প্রতিদিন বৈকালে বেশ একটি বড়ো সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্পলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কবি, গল্পলেখক ও 'সাধনা'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক (অধুনা চলচ্চিত্র-পরিচালক) শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আনন্দবাজারের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রকর ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও 'ভারতবর্ষে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আরও অনেকে, সকলের নাম মনে পড়ছে না। 'যমুনা'র কর্ণধার ফণীবাবুর কথা বলা বাহুল্য। পরে এই আসরেরই অধিকাংশ লোককে নিয়ে সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত 'ভারতী'র দল গঠিত হয়। অবশ্য 'ভারতী'র দলের আভিজাত্য এ আসরে ছিল না—এখানে ছোটো-বড়ো সকল দলেরই সাহিত্যিক অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতেন। অসহিত্যিকেরও অভাব ছিল না। এখানে প্রতিদিন আসরে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ হত, শরৎচন্দ্রও মহা উৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং

আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কাতর্কিতে পরিণত হত তখনও গলার জোরে তিনি কারুর কাছে খাটো হতে রাজি ছিলেন না—যদিও যুক্তির চেয়ে কণ্ঠের শক্তিতে সেখানে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সেখানে যেমন অসঙ্কোচে ও স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেত, তার কোনও রচনার মধ্যেও তা পাওয়া যাবে না। সময়ে সময়ে আমরা সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে রীতিমতো কোণঠাসা করে ফেলেছি, কিন্তু তিনি চটা-মেজাজের লোক হলেও তর্কে হেরে গিয়ে কোনওদিন তাকে মুখভার করতে দেখিনি; পরদিন হাসিমুখে এসে আমাদেরই সমবয়সী ও সমকক্ষের মতন আবার তিনি নূতন তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে অক্ষয় যশের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রকে যিনি দেখেননি, আসল শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব বললেও চলে। কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে তার প্রকৃতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যে বা আর্টে একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করলে প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো প্রাণের দায়ে না হোক, মানের দায়ে ভাব-ভঙ্গি-ভাষায় সংযত হতে হয়।

শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ করে তার প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যেসব মতবাদ আছে, তার মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলত না। তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনও এঁকো না। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে না আনলেও চলবে। আবার—পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় দেখবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন, এটা বড়ো লেখকের কাজ হয়নি। উত্তরে আমরা বলতুম, কেন, আপনিও তো দুরাত্মার ছবি আঁকতে ত্রুটি করেননি। আবার আপনিও তো কোনও

কোনও উপন্যাসে নায়িকাকে পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি শাস্তি দিয়েছেন? কিন্তু এ প্রতিবাদ তিনি কানে তুলতেন না। উপবীতকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না, কৌলীন্যগর্ব তার যথেষ্ট ছিল। 'ভারতী'র আসরে একদিন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পইতা নেই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে বললেন, ও কী হে চারু, তোমার পইতে নেই! চারুবাবু হেসে বললেন, শরৎ পইতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না। শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন, 'না, না, বামুন হয়ে পইতা ফেলা অন্যায়।' রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি! কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। 'যমুনা'র পরে ওই বাড়িতেই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় 'মর্মবাণী'র কার্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি ছিলুম তখন 'মর্মবাণী'র সহকারী সম্পাদক। 'যমুনা'র আসরে আমার যেসব সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন, এই নূতন আসরেও তাদের কারুরই অভাব হল না, উপরন্তু নূতন গুণীর সংখ্যা বাড়ল। যেমন স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি মাঝে মাঝে নিজের নূতন রচনা শোনাতে আসতেন। এবং 'মানসী'রও দলের একাধিক সাহিত্যিক এখানে এসে দেখা দিতেন। এই 'মর্মবাণী'র আসরে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, সবুজপত্রে রবিবাবু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখছেন, তোমরা দেখে নিয়ো, আমি এইবার যে উপন্যাস লিখব, 'ঘরে-বাইরে'র চেয়েও ওজনে তা একতিলও কম হবে না। প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ করে বললেন, 'যে উপন্যাস এখনও লেখেননি, তার সঙ্গে ঘরে-বাইরের তুলনা আপনি কী করে করছেন?' কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তোমরা দেখে নিয়ো!' এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তার সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, খুব সম্ভব শরৎচন্দ্রের পরের উপন্যাসের নাম ছিল 'গৃহদাহ'—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনও একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নকলে চরিত্র

অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সে-কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হননি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।

হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোনও লোকের যে-কোনও কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। যদি তাকে বলা হত, শরৎদা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে, তাহলে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না করেই তিনি হয়তো কোনও বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চটে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোনও কোনও দুষ্টু লোক এইভাবেই তাকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী করে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওবারেই এই সব অসৎ চক্রান্ত সফল হয়নি।

আমি এখানে খালি ব্যক্তিগতভাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে ও দেখাতে চাইছি, কারণ এই সদ্যগত বৃহৎ বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে এখন ব্যক্তিগত কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসছে না, আসা স্বাভাবিকই নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি বা সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করবার কোনও ইচ্ছাই এখন হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করলে মন্দ হবে না। আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত বলে প্রচার করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার জন্যে হাস্যকর চেষ্টা করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড়ো বড়ো কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হয়েও শরৎচন্দ্র কোনওদিন এই সব ময়ূরপুচ্ছধারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়ননি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব করবার অধিকার তার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি বারবার এই ভাবটাই প্রকাশ করে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশি করিনি, আমার জ্ঞানও বেশি নয়, তবে আমার

লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে, আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই। ইনটেলেকচুয়াল গল্প-টল্প কাকে বলে আমি তা জানি না..এখনকার অভিজাত সাহিত্যিকরা লোককে ধাক্কা মেরে ধাপ্পা দিয়ে চমকে দিয়ে বড়ো হবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো যারা যথার্থই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, তারা বড়ো হন বিনা চেষ্টায় হাওয়ার মতো অগোচরে বিশ্বমানুষের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়ে। জোর করে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পরের প্রাণে আশ্রয় খুঁজলে নিজের প্রাণকে আগে নিবেদন করা চাই। তুমি অভিজাত সাহিত্যিক, তুমি হচ্ছ সোনার পাথর-বাটির রূপান্তর! যশের কাঙাল হয়ে সাগ্রহে লেখা ছাপাবে, অথচ জনতাকে ঘৃণা করবে। অসম্ভব।

'যমুনা'-অফিসে শরৎ ও তার ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ওই ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড়ো বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে। ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড়ো বড়ো ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট। ভেলুর অকালমৃত্যুর কারণ বোধহয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।

'যমুনা'-অফিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা দুটো-তিনটের সময়ে এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য-আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোনও কোনওদিন রাত্রি দুটো-তিনটেও বেজে যেত। সে সময়ে তার সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চলে গেলে শরৎচন্দ্র শুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনি। বেশি লোকের সভায় আলোচনা (conversazione) ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্পগুজব করবার শক্তি ছিল তার অদ্ভুত ও বিচিত্র—শ্রোতাদের তার সুমুখে বসে থাকতে হত মন্ত্রমুগ্ধের মতো। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার 'যকের ধন' উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তার মুখের ভাষার অভাবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ির অনতিদূরেই। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তার জীবনের কোনও গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেননি। এইভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরও বছর-কয়েক পরে তার সঙ্গে আলাপ হলে আমার ভাগেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটত না। এও বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে উঠেছিল—much familiarity brings contempt,এ প্রবাদ সব সময়ে সত্য হয় না।

একদিন সকালবেলায় মা এসে বললেন, 'ওরে, তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কী মিষ্টি গলা?' কৌতুহলী হয়ে নীচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, শরৎচন্দ্র কখন এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠেলান দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই

চমৎকার! আমাকে দেখেই তিনি মৌন হলেন, কিছুতেই আর গাইতে চাইলেন না! তারপর আরও কয়েকবার আমার নীচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছি, আড়ালে থেকেও শুনেছি, কিন্তু যেই আমাকে দেখা অমনি তার ভীরু কণ্ঠ হয়েছে বোবা! অথচ তার সঙ্কোচের কোনওই কারণ ছিল না, তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত-সাধনা করলে তিনি নাম করতেও পারতেন রীতিমতো।

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাস করতেন, তখন প্রতিদিন আর তার দেখা পেতুম না বটে, কিন্তু আমাদের অন্যান্য আসরে তার আবির্ভাব হত প্রায়ই। কিন্তু তার সম্বন্ধে সমস্ত গল্প বলতে গেলে এখানে কিছুতেই ধরবে না, অতএব সে চেষ্টা আর করলুম না। তিনি পানিত্রাসে যাবার পর থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা হত ন-মাসে ছ-মাসে, কিন্তু যখনই দেখা হত বুঝতে পারতুম যে, আমার কাছে তিনি সেই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সের যুবক ও পুরাতন শরৎচন্দ্রই আছেন। অতঃপর তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে গল্প বলে এবারের কথা শেষ করব।

একদিন আমাদের এক আসরে বসে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টানছেন, এমন সময়ে অধুনালুপ্ত 'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব। 'বিদূষক'-সম্পাদক এই শরৎচন্দ্রকে কথায় হারাতে কারুকে দেখিনি এবং খোঁচা খেলে তিনি নিরুত্তর থাকবার ছেলেও ছিলেন না। 'বিদূষক'-সম্পাদককে অপ্রস্তুত করবার কৌতুকের লোভে শরৎচন্দ্র বললেন, এসো বিদূষক শরৎচন্দ্র। শরৎ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিলেন, কী বলছ ভাই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র? এই কৌতুকময় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরুত্তর হতে হল 'চরিত্রহীন' প্রণেতাকেই।

একদিন বিডন স্ট্রিটের মোড়ে এক মণিহারির দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কী কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি কিছু খাও!' আমি বললুম,

‘এই মণিহারির দোকানে আপনি আবার আমার জন্যে কী খাবার আবিষ্কার করলেন?’—‘কেন,অনেক ভালো ভালো লজেনচুস রয়েছে তো!’—‘বলেন কী দাদা,আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোটো বটে,কিন্তু আমাকে লজেনচুস-লোভী শিশু বলে ভ্রম করছেন কেন?’ শরৎচন্দ্র মাথানেড়ে বললেন, ‘নাহে না,তুমি বড়ো বেশি সিগারেট খাও! ও বদ-অভ্যাস ছাড়ো। হয় তামাক ধরো, নয় লজেনচুস খাও!’ দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয়নি।

শরৎচন্দ্র ভেলুকে কী রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোনও এক ভক্ত এক চাঙারি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তার পাশে বসে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙারি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব পরিণাম দেখে তার মনের অবস্থা কী রকম হল, সেকথা আমরা শুনিনি।

একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে বললেন, নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হল দেখছি!’—

‘কেন শরৎদা, কী হল?’—‘আর ভাই, বলো কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ হয়েছে, পাড়ার লোকগুলো পাজির পা-ঝাড়া’—‘সেকি, ভেলু কী করেছে?’—‘কিছুই করেনি ভাই, কিছুই করেনি! একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয়নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে শুধু ইঞ্চি-চারেক মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে!’—‘অ্যাঃ, বলেন কী, ইঞ্চি-চারেক মাংস?’—‘হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কী! এই সামান্য

অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ভেলুর মুখে 'মাজল' পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কী যে কষ্ট হবে, ভেবে দাখো দেখি!'

সারমেয়-অবতার ভেলুর এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছি। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরের বাড়িতে, সেই সময়ে এক সকালে টেক্সোবাবু এলেন টেক্সোর টাকা আদায় করতে। বাইরের ঘরে টেক্সোবাবু তার তল্পিতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরাম করে শুয়ে আছে—যদিও তার অসন্তুষ্ট দৃষ্টি রয়েছে টেক্সোবাবুর দিকেই। শরৎচন্দ্র টেক্সোর টাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। টেক্সোবাবুর কাজ শেষ হল—তিনিও নিজের টাকার তল্পির দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জন করে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ ভেলুর একটা স্বভাব ছিল এই, তার মনিবের বাড়িতে বাহির থেকে কেউ কোনও জিনিস এনে রাখলে সে কোনও আপত্তি করত না, কিন্তু বাড়ির জিনিসে হাত দিলেই তার কুকুরত্ব জেগে উঠত বিষম বিক্রমে! সুতরাং টেক্সোবাবুর অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয়! তিনি মহা-আতঙ্কে পিছিয়ে পড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে চিত্রাপিতের মতো—কারণ একটু নড়লেই ভেলু করে গোঁ-গোঁ! দুই-তিন ঘণ্টা পরে মান-আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র আবার যখন সেখানে এলেন, টেক্সোবাবু তখনও দেওয়ালের ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন! বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবে টেক্সোবাবুর মুক্তিলাভের সৌভাগ্য হল!

মনোমোহন থিয়েটারে চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'আঁধারে আলো' দেখানো হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও গিয়েছি। একখানা ঢালা বিছানা পাতা 'বক্সে' শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেলুম। ছবি দেখানো শেষ হলে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের এক পাটি তালতলার চটি অদৃশ্য হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পাটি পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ

হয়ে অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, এক পাটি চটি নিয়ে আর কী করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান। শরৎচন্দ্র বললেন, 'ক্ষেপেছো? চোরবেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখছে! আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব!' তিনি খালি পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পরদিনই 'বক্সে'র তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনও সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন আর্ট ও সাহিত্যের আসর 'বিচিত্রা'র অধিবেশন হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং প্রতি অধিবেশনের পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, অমুক অমুক লোকের জুতা চুরি গিয়েছে। আমরা সকলেই চিন্তিত, কারণ 'বিচিত্রা'র ঢালা আসরে জুতা খুলে বসতে হত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেঁড়া, পুরানো জুতার আশ্রয় নিলেন, কেউ কেউ জুতা না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন এবং আমরা অনেকেই জুতার দিকেই মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র এই দুঃসংবাদ শুনেই খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে বগলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে বসলেন— সেদিন আসরে লোক আর ধরে না। ইতিমধ্যে কে গিয়ে চুপি চুপি বিশ্বকবির কাছে শরৎচন্দ্রের গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে শুধোলেন, শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী? শরৎচন্দ্র মাথাচুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ্ঞে, বই!' রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?' শরৎচন্দ্র লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারেন না!

বছর-আড়াই আগেকার কথা। প্রায় বৎসরাবধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন আমি আমার নতুন বাড়িতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিনতলার বারাদার কোণে বসে রচনাকার্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে একতলায় পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে গিয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেনে না, তোমরা যখন জন্মাওনি তখন আমি তোমাদের পুরনো বাড়িতে আসতুম, তোমার বাবা আমাকে দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন!'এ যে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—আজ কুড়ি-বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিতভাবে আবার আমার বাড়িতে! বিশ্বাস হল না—তিনি আমার এ-বাড়ি চিনবেন কেমন করে? কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখলুম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন সত্য-সত্যই শরৎচন্দ্র—তার পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজাকুমার বসু সবিস্ময়ে বললুম, 'শরৎদা, এতকাল পরে আমার বাড়িতে আবার আপনি!' শরৎচন্দ্র সহস্যে বললেন, 'হ্যাঁ হেমেন্দ্র। গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি!' আমি সানন্দে তাকে তিনতলার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, 'এ যে আমার পরম সৌভাগ্য দাদা, এ যে বিনা মেঘে জল!' 'কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এ যে হাসির কথা?' তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালে অবিখ্যাত শরৎচন্দ্রের মতোই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।

শরৎচন্দ্র শেষ যেদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, আমার দুইমেয়ে শেফালিকাও মুকুলিকার কাছে বলে গিয়েছিলেন, শোনো বাছা, এসব সিগারেট ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো, তাহলে আবার তোমাদের বাড়িতে আমি আসব!' তার কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে

‘চরিত্রহীনে’র প্রথম অভিনয় রাত্রে আমার মেয়েরা তার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল, কই, আপনি তো আর এলেন না? শরৎচন্দ্র বললেন, ‘আমার জন্যে গড়গড়া আছে?’—‘হাঁ! শুনে তিনি সহস্যে অঙ্গীকার করলেন, ‘আচ্ছা, এইবারে তবে যাব!’ কিন্তু এখন আর তার সে-অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি, তার গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর এলেন না? হায়, স্বর্গ থেকে মর্ত্য কতদূর?